অনমনীয়া

আমাদের প্রকাশিত লেখিকার অন্যান্য বই ঃ—

নক্‌শা কাটা ঘর

ভি. আই. পি-র বাড়ীর লোক

স্থান কাল পাত্র

অনমনীয়া

....

উত্তেজিত জনতা সেই তখন থেকে দীপক ম্যানসনের বড় গেটের সামনে জটলা করছিল। তার সঙ্গে গালাগালি দিচ্ছিল সমানে, আর মাঝে মাঝে কেউ কেউ একটা অর্থহীন চীৎকার করে উঠছিল। অনেকটা যেন জন্তুর আওয়াজের মত।

উত্তাপ ক্রমশঃই বাড়ছে, কারণ ফালতু লোকও এসে এসে জমে যাচ্ছে এবং জনতার চরিত্র হিসেবে তারা যথারীতিই এ ব্যাপারের কিছু না জেনেই গালাগালিতে গলা মেলাচ্ছে। গেট একেবারে আটকা পড়ে গেছে। সামনের কম্পাউণ্ডটাও ক্রমশঃ ভর্তি হয়ে যাচ্ছে।

বড ভীড়টা গেটের সামনে হলেও, নীচের তলায় সাত নম্বর ফ্ল্যাটের দরজাটাই যে ওদের লক্ষ্য তা বোঝা যাচ্ছে সাত নম্বরের দরজার সামনের চেহারা দেখে। এই বন্ধ দরজার সামনেও বেশ একটা জমাট জটলা, এরা একযোগে প্রবল হুঙ্কারে যা বলছে, তার আলাদা আলাদা ভঙ্গী বুঝতে না পারলেও একটা ভাষা বার বার শোনা যাচ্ছে—'বেরিয়ে আয় শালা, চামড়া ছাড়িয়ে নিই তোর।'

অবশ্যই কেউ চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়াবার জন্যে বেরিয়ে আসছে না। অতএব দমাদ্দম ধাক্কা পড়ছে দরজায়।

দেখে আশঙ্কা হচ্ছে, হয়তো দীপক ম্যানসনের ওই মজবুত দরজাটাও এ ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে ভেঙ্গে পড়বে। আর ওই উত্তেজিত জনতা সবলে ঢুকে পড়ে সব কিছু তছনছ করে দেবে, হয়তো বা সত্যিই ওই ছাল ছাড়িয়ে নেবার মত ভয়ংকর কাজটাই করতে যাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জানালা টানালা সব বন্ধ।

আশেপাশের একতলার ফ্ল্যাটগুলোর সমস্ত দরজা-জানলাও 'আটকাঠে' বন্ধ, কারণ বাসিন্দাদের কৌতূহলের থেকে ভয়টা বেশী

জোরালো। দোতলা তিনতলা চারতলার ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা জানালা ভাল করে না খুলে এবং খোলা ঝুলবারান্দায় না বেরিয়েও কিছুটা কৌতূহল চরিতার্থ করছে চোরের মত উঁকিঝুঁকি মেরে, বাথরুমের কি রান্নাঘরের জানলা টানলা থেকে।

তারা এই ঘটনার কারণ জানে না, শুধু যা দেখেছে, তা হচ্ছে এই ঃ কতকগুলো লোক কোন একটা ছুটন্ত লোকের পিছু পিছু 'রে রে' করে ছুটে আসছিল 'শালাকে খতম কর, মেরে তক্তা বানিয়ে দে' বলতে বলতে ছুটন্ত লোকটা ওই সাত নম্বর ফ্ল্যাটের খোলা দরজা দিয়ে (অথবা দরজা খোলা পেয়ে) ঢুকে পড়ে মুহূর্তে দরজা বন্ধ করে দেওয়ায় 'রে রে'-করারা দরজা ধাক্কাতে শুরু করল। তারপর যেন মাটি ফুঁড়ে লোক উঠে এলো গাদা গাদা, গেট ঘেরাও করে ফেলল। উঁচুতলা থেকেও ওরা সবাই ভয়ে কাঁপছে, সকলেরই তো বাড়ির লোকেরা এখনো অনেকেই বাড়ির বাইরে। কী করে গেট পার হয়ে আসবে তারা? কী যে ঘটছে, তাও তো বোঝা যাচ্ছে না, তবে ব্যাপারটা যে 'পূর্ব পরিচিত' কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা নয়, তা বোঝা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। এবং রহস্যের মূল সূত্র ওই সাত নম্বর ফ্ল্যাটের মধ্যেই নিহিত।

এখন 'রয়টার' অর্থাৎ বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে বেড়ানো মহিলাদেরও আসবার সময় নয়, চার-পাঁচটা করে ফ্ল্যাটে কাজ করেও মহিলারা অনেকক্ষণ আগেই এই দীপক ম্যানসনের গেট পার হয়ে চলে গেছেন।

তা নইলে ওনাদের কেউ একজন এসে হাজির হলেই রহস্যভেদ হয়ে যেত। শুধু পাড়ারই নয়, শহরের যে-কোন খবরই ওরা আকাশবাণীর আগে সরবরাহ করে, খবরের কাগজের আগে বিস্তারিত বিবরণ শোনায়। এখন ওরা যে যার ঘরে। সময়টা বড়ই গোলমেলে।

এই দীপক ম্যানসনের অনেকেরই টেলিফোন আছে। তাঁরা সম্ভব মত তাদের কর্তাদের কর্মস্থলে ফোন করে এই অবস্থাটা সম্পর্কে সাবধান করাতে রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন।

কিন্তু মুসকিল এই, এক্ষেত্রেও সময়টা গোলমেলে। অনেকেই এখন পথিমধ্যে। কর্মস্থল ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন অথচ বাড়ি এসে পেঁছিননি। তাছাড়া—যে ছেলেরা কলেজে পড়ে? কলেজ-ফেরতা আড্ডা-পর্ব সেরে দশটায় এসে বাড়ি ঢোকে? তাদের কাছে খবর পেঁছিবে কে? অথবা যে মেয়েটা বান্ধবীদের সঙ্গে সন্ধ্যার শোয়ে সিনেমা দেখতে গেছে?

বাড়িতে মহিলারা অস্থির হচ্ছেন।

তবে কোন কোন বাড়িতে এখন আদৌ কেউ নেই, বাড়ি চাকরের হেফাজতে পড়ে রয়েছে; যে-চাকর একাধারে ঠাকুর চাকর এবং দ্বারোয়ানের ভূমিকা পালন করে থাকে।···দীপক ম্যানসন হচ্ছে অভিজাত পরিবারদের জন্য। আর অভিজাত মহিলারা সবাই কিন্তু আর সন্ধ্যাবেলা বাড়ি বসে থাকে না।

যাঁরা একাধারে তিন ভূমিকায় অভিনয়রত একজনের হাতে বাড়ি ছেড়ে রেখে গেছেন, তাঁদের সেই লোক গোলমালের সূচনা দেখেই রান্নাঘরে গ্যাসের উনুন নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে জটলায় মিশে উত্তাপ বাড়াবার কাজে লেগে গেছে। দরজার ল্যাচ-কীর চাবি তাদেরই কাছে। অতএব অসুবিধের কিছু নেই।

চারতলা ম্যানসনের চল্লিশটা ফ্ল্যাটের অনেক রকম অবস্থা, তবু প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রত্যেকের মানসিক অবস্থার কিছু না কিছু সাদৃশ্য আছে, বাদ ওই সাত নম্বর।

সাত নম্বর ফ্ল্যাটের ভিতরের দৃশ্য—এখন এই বাড়ির মহিলারা সকলেই বাড়িতে উপস্থিত, যথা গৃহিণী সুলেখা, পুত্রবধূ স্বাতী, অনূঢ়া কন্যা নীতা, এবং বিবাহিতা কন্যা রীতা, যে নাকি মাত্র একদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে। দুটি শিশু আছে, রীতার চার বছরের মেয়ে মৌ, এবং স্বাতীর তিন বছরের ছেলে বাদু।

দুজন পুরুষ আছে, এক হচ্ছে চাকর যতীন, এবং জামাতা বি. কে. ঘোষ. অর্থাৎ বিভাসকমল ঘোষ।···রীতা ওকে 'কমল' বলে ডাকে, শ্বশুর-শাশুড়ী-বড় শালা ডাকেন 'বিভাস'।

শ্বশুর রঞ্জিত মিত্তির এখন বাড়ির বাইরে, শালা সুজিত মিত্তির বাংলার বাইরে।

পরিবারের চেহারা হচ্ছে এই।

একটু আগে তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মত ছুটতে ছুটতে এসে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে, সজোরে সেটা বন্ধ করে দিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে যে মানুষটা হাঁপিয়েছে, সে হচ্ছে ওই বিভাস-কমল।···এমনিতেই তার টকটকে চেহারা, অন্য কারণে মুখের রং আরো লালচে, তখন সেই মুখ দেখে মনে হচ্ছে এখুনি বুঝি চামড়া কেটে রক্ত ঝরবে। বুকের ওঠা-পড়া দেখে মনে হয়েছে স্ট্রোক্ হলো নাকি!

ওদিকে বাইরে ক্রুদ্ধ জনতার গর্জন, এদিকে এই। ছুটে এসেছেন শাশুড়ী, ছুটে এসেছে বৌ শালী শালাজ, ঠাকুরটাও।··· মেয়ে মৌও খেলা ফেলে ছুটে এসে চেঁচিয়ে কেঁদেই বাপের হাঁটু ধরে ঠেলা মেরে মেরে বলছে, 'ও বাপী, তুমি ওরকম করছ কেন? তুমি কি মরে যাবে! ও বাপী—'

মৌয়ের চার বছরের জীবনে মৃত্যুর সঙ্গে কখনো পরিচয় ঘটেনি, শুধু জানে গল্পের বাঘেরা মরে, গল্পের রাক্ষসরা মরে, তবু তার বাপের চেহারায় অস্বাভাবিকতা দেখে চেঁচিয়ে উঠেছে, 'ও বাপী, তুমি কি মরে যাবে?'

'আঃ, সরে যা অসভ্য মেয়ে—' বলে রীতা ওকে ঠেলে দিয়ে যতীনকে বলেছে, 'নিয়ে যা।' যতীন জবরদস্তি করে সরিয়ে নিয়ে গেছে। তারপর মৌ যতীনকে আঁচড়ে কামড়ে লাথি মেরে নিজে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করেছিল, এখন উঠে বসে কাঁদছে। বাদুও এ পরিবেশে কাঁদাটাই সমীচীন ভেবে কান্না জুড়েছে, এবং মা এসে ভোলাতে বসলো না দেখে কান্নাটা থামাতে রাজী হচ্ছে না। মৌয়ের জীবনেও তো মায়ের কাছে এরকম দুর্ব্যবহার লাভ অপ্রত্যাশিত এবং প্রথম।

কিন্তু এখন ওদের কান্নায় কে কর্ণপাত করছে? বাইরের তুমুল কল্লোল এবং দরজায় দমাদ্দম ধাক্কা বয়স্ক লোকগুলোকেও কাঁদিয়ে ছাড়ছে।

সুলেখা কেঁদে কেঁদে বলছেন, 'ও বাবা বিভাস, কী হয়েছে? ওরা অমন করছে কেন?'

স্বাতী বলছে, 'জিগ্যেস পরে করবেন মা, জামাইবাবুকে আগে বসতে দিন।'

অতঃপর রীতা নীতা বিভাসকে প্রায় ধরে নিয়ে এসে ড্রইংরুমের সোফায় বসিয়ে পাখা খুলে স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে ফ্রীজের ঠাণ্ডা জল এনে খেতে দিয়েছে। রীতা গায়ের জামাটা খুলে দিয়েছে, আর স্বাতী বার বার বলেছে, 'জামাইবাবু, আপনি একটু শুয়ে পড়ুন।'

কিন্তু শুয়ে পড়বে কে ?

যখন বন্ধ জানালার ভিতর থেকেও উদ্দাম গর্জন ছুটে আসছে, 'বেরিয়ে আয় শালা, হিম্মত থাকে তো বেরিয়ে আয়। ছাল ছাড়িয়ে নিই তোর। শালা বদমাস, মানুষ চাপা দিয়ে পালিয়ে এসে পার পাবি তুই,' তখন হিম্মতওয়ালা কেউ শুয়ে থাকতে পারে ?

জল খাওয়ার পরই মিনিট দুই খাঁচার বাঘের মত পদচারণা করে হঠাৎ বাঘের মতই গর্জন করে ওঠে সে, 'মা, বাবুর বন্দুকটা বার করে দিন তো—'

রঞ্জিত মিত্তিরের ছেলেমেয়েরা চাকর-টাকরের দেখাদেখি বাবাকে 'বাবু' বলতে শিখেছিল. অতঃপর জামাই এবং পুত্রবধূও তাই ডাকে। এমন কি সুলেখাও সেই ডাকেই অভ্যস্ত আছেন।

বাবুর বন্দুকটা বার করে দিন তো।

শুনে সুলেখার হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস করে উঠে যেন স্থানচ্যুত হয়ে যায়। সেখানে একটা ভয়াবহ শূন্যতার বোধ সুলেখাকে বসিয়ে দেয়। বসে পড়েই সুলেখা শুকনো মুখে বলেন, 'বন্দুক !'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। হারামজাদাগুলোর ইহলীলা শেষ হোক। সব কটার খুলি উড়িয়ে দিই।'

রীতা এতক্ষণ মাটিতে পাতা কার্পেট থেকে নীচু হয়ে বসে সেই জলটা ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলছিল, যেটা বিভাসকমলের চোখে-মুখে ছিটোনোর সময় পড়েছিল। এখন রীতা দাঁড়িয়ে উঠে তীব্র গলায় বলল, 'মোটর বাইক নিয়ে এখন কোথায় বেরনো হয়েছিল ?'

বিভাস ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে ওঠে, 'কোথায় বেরুনো হয়েছিল, সেটা এমন একটা ইমপর্ট্যাণ্ট কথা নয়।'

রীতা তীব্র অথচ চাপা গলায় বলে, 'তাহলে আরো ইমপর্ট্যাণ্ট কথাই বলি—কাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে এসে গর্তে ঢুকে পড়েছ। রাস্তার লোক, না পাড়ার?'

সুলেখা ভয় পেয়ে বলেন, 'ওসব কি কথা রীতা? চাপা দিতে যাবে কেন?'

রীতা ক্ষুব্ধ তীব্র গলায় বলে, 'দিতে যাবে কেন? দিতে তো কত কারণেই যায় মা। রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়াটা কি কিছু আশ্চর্য কথা? আমি শুধু ভাবছি পালিয়ে এলেই কি প্রাণ বাঁচানো যায়?'

বিভাসকমল ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'তাহলে কি করতে হবে? ক্ষ্যাপা কুকুরদের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বলতে হবে খাও তোমরা আমাকে? বাইকটাকে তো ইঁটিয়ে জখম করে দিল, খুব খুশী হতে বোধহয় আমাকেও তাই করলে?'

'ও বিভাসদা, সত্যি সত্যি কাউকে চাপা দিয়েছেন নাকি?' নীতা ভাঙা ভাঙা গলায় বলে, 'মরে গেছে লোকটা? কি রকম লোক, ছোটলোক, না ভদ্রলোক? মেয়ে না ছেলে?'

রীতা ছোট বোনের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের গলায় বলে, 'ছোট-লোক হলে একটু সান্ত্বনা পেতিস, তাই না?'

এরপর আর কেউ কিছু বলতে পারল না, দরজার ধাক্কায় চারতলা প্রাসাদটা যেন ছাদ সুদ্ধ কেঁপে উঠল। এবং প্রবল কলরোল প্রবলতর হয়ে উঠল অকথ্য কুৎসিত গালাগালির ভাষা বহন করে।···

এখন আর 'বেরিয়ে আয়' নয়, 'বের করে দিন।···শালা শয়তানকে বের করে দিন বলছি। রঞ্জিত মিত্তিরের আদরের জামাই বলে, পাড়াসুদ্ধু সকলের জামাই নয়। এখনো ভালয় ভালয় বের করে না দিলে ইঁটিয়ে বাড়ি শেষ করে বার করে আনা হবে। হারামজাদা শুয়োরের চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে জুতো বানাব—'

এরা হচ্ছে পাড়ার মস্তান।

নিজেদেরকে এরা ন্যায় নীতি ও সত্যধর্মের ধারক-বাহক বলে গণ্য করে। তাই যখন যেখানে কিছু গোলমেলে ব্যাপার দেখে, সেখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে গোলমালটাকে দশগুণ করে তোলে।...এই সব ভাষা তাদের আয়ত্ব, আর এই সব গালমন্দ তারা অন্যের স্টক থেকে শিখেছে, যত নিজেরা সৃষ্টি করেছে তার থেকে বেশী। সেগুলো বলবার সুযোগ তো সব সময় মেলে না, তাই সুযোগ পেলে কখনো অবহেলা করে না। আর আজকের ব্যাপারটাতো অবহেলার নয়ও।

দরজাটা ভেঙে পড়লে কি হবে ভেবে ঠক ঠক করে কেঁপে সুলেখা চেরা গলায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'অ বৌমা, তোমার শ্বশুরকে ফোন কর না—'

...বলে আবার নিজেই ছুটে টেলিফোনের কাছে যান।... রিসিভার তুলে ডায়াল করতে যান, হাত থর থর করে কাঁপে। প্রায় আছড়ে পড়ার মত করে বলেন, 'অ বৌমা, অ নীতা, আমার যে ওনার অফিসের ফোন নম্বরটা মনে পড়ছে না।...তোরা করে দে। বল শীগগির করে চলে আসতে।'

স্বাতী নরম গলায় বলে, 'বাবু কি এখনো অফিসে আছেন মা ?'

'আছেন আছেন।' সুলেখা উদ্ব্যস্ত গলায় বলেন, 'ওনার তো দেরীই হয়...নীতা দেখ না—' বাইরের উত্তাল তরঙ্গে কেউ কারুর কথা শুনতে পায় না।

এখন বিভাস আর একবার গর্জে ওঠে, 'নীতা বন্দুকটা বার কর।'

সুলেখার না হয় জামাতা না দেবতা, কিন্তু নীতার তো নয়!

তাই নীতা বলে ওঠে, 'কী বলছেন বিভাসদা ? বন্দুক নিয়ে কী করবেন ?'

বিভাসকমল অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে বলে, 'বন্দুক নিয়ে কী করে জানো না ? শিকার করব। বার কর, বার কর।'

হাত-পা কাঁপছে ওর।

রীতা এই ভয়ানক উত্তেজনার মধ্যেও স্থির গলায় বলে, 'একটা শিকার করে এসে শখ মেটেনি ?'

'শাটআপ !'

বিভাসকমল প্রচণ্ড গলায় বলে, 'সব সময় নাটক করা চাই।... মা. বন্দুক না দিন তো বলুন, আমি খালি হাতে দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছি—'

সুলেখা ছুটে গিয়ে জামাইয়ের গেঞ্জি চেপে ধরেন, 'ও বাবা, অমন সর্বনেশে কাজ কোর না, ওরা তো এখন ক্ষ্যাপা কুকুরের মতন হয়ে আছে।'

স্বাতী ওঘরে চলে গিয়েছিল, এখন হঠাৎ বেরিয়ে এসে তাড়াতাড়ি বাইরের দরজাটায় চাবি লাগিয়ে দিয়ে চাবিটা নিজের ব্লাউজের মধ্যে ফেলে রাখে।

না. এখান থেকে অন্তত নিয়ে নিতে পারবে না জামাইবাবু, অতএব গোঁয়ার্তুমি করে বেরিয়ে পড়তে পারবে না।

রীতা সেই দিকে তাকিয়ে দেখে।

রীতা অদ্ভুত একটু হেসে বলে, 'কেন ভাবছিস বৌদি ? মনে করছিস ও সত্যি বেরিয়ে পড়বে ?'

স্বাতী একটু ভীতু। স্বাতী ভয় ভয় চোখে বিভাসের দিকে তাকিয়ে ইশারায় নিজের মাথাটায় হাত বোলায়। অর্থাৎ মাথা তো এখন গরম, কী করবে বলা যায়। রীতা হাত নেড়ে অভয় দেয়।

আবার দরজায় ধাক্কা পড়ে, 'ভাঙ, ভেঙে ফেল। বদমাসটাকে টেনে বার করে নিয়ে আয়।'

কেবলমাত্র ন্যায় নীতির পক্ষ বলেই নয়, ব্যক্তিগত আক্রোশও মিশেছে ওর সঙ্গে। ওই দাম্ভিক উন্নাসিক ডাঁটুস লোকটাকে পাড়ার সবাই চেনে। যখন-তখন ওই খ্যাঁকখেঁকে মোটরবাইকটার পিছনে বৌ বসিয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে শ্বশুরবাড়ি আসে শালা, ভাব দেখে মনে হয় যেন রাস্তাটা ওর খাশ তালুক। মার মার কাট কাট করতে করতে আসবে, দেখবে না যে রাস্তার মাঝখানে ইঁট সাজানো ক্রিকেটের আসর তছনছ হল কিনা।

যেতে আসতে মন্তব্যও কি কম করে ?

ফট করে বলে যাবে, 'যত্তোসব লোফারের আড্ডা।' বলে যাবে, 'সব কটাকে পুলিশভ্যানে চাপিয়ে চালান করে দিতে হয়।' কিছু না হোক পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে বলে যাবে, 'রাবিশ!' বলে যাবে, 'মস্তান।'

সেই সব অপমানের জ্বালা নেই ?

নেই তার স্মৃতি ?

তুমি যদি আমায় মশা-ছারপোকার তুল্য দেখো, সুযোগ পেলে আমিও তোমায় মশা-ছারপোকার তুল্য টিপে মারব।

নেহাত রঞ্জিত মিত্তিরের জামাই বলেই এযাবৎ সয়ে এসেছে। আড়ালে বলেছে, 'নবাব খাঞ্জা খাঁ।' বলেছে, 'ভাইসরয়।' বলেছে, 'ডাঁটুস।'

আজ বিভাসকমল ওদের মস্ত সুযোগ এনে দিয়েছে। তাছাড়া 'পাবলিক' যখন আইন নিজের হাতে নেয়, তখন মাত্রা রাখতে পেরে ওঠা সম্ভব নয়। কারণ অবারিত দরজা দিয়ে ক্রমশঃ অনেক হাত এসে জোটে।

অসহ্য কটু কথা শুনে আসছে, এবং মনে হচ্ছে দরজাটা আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।···ধাক্কার চোটে ছিটকিনি ভেঙেছে, লকটা আটকে আছে তাই। কিন্তু কতক্ষণ থাকবে ?

ওদিকে জানলায় ইঁট পড়ছে।

না, আরো ঊনচল্লিশটা ফ্ল্যাট থেকে কোন সাড়া নেই···ভিতরে ভিতরে অনেকেই টেলিফোনে নিজের লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, বাড়ির বাইরের লোকেরা ক্রমশঃ এসেও পড়ছে, কিন্তু কেউ সাহস করে পুলিশে খবর দিচ্ছে না।

কি জানি বাবা, খবর দিয়ে কে ফ্যাসাদে পড়তে যাবে। খবর দেওয়া মানেই তো সমস্ত দায়িত্বটি ঘাড়ে নেওয়া। তাছাড়া পরে তো প্রকাশিত হয়ে যাবে কে খবর দিয়েছিল। ঘটনা স্রোত যে দিকে প্রবাহিত হয় হোক।

ক্রমশঃ এই উত্তেজনার কারণটা সবাই জেনে ফেলেছে।···

রঞ্জিত মিত্তিরের মাতাল জামাইটা তার রাক্ষসের মত মোটর-বাইকটা নিয়ে বীরবিক্রমে আসতে আসতে শশী মিস্ত্রীর বছর আষ্টেকের মেয়েটাকে চাপা দিয়েছে।

দিয়েছে সে না হয় অসতর্কে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ নেমে পড়ে মেয়েটা সম্পর্কে উচিত ব্যবস্থা করা উচিত ছিল না কি? হাসপাতালে নিয়ে যাও, টাকাকড়ি খরচা করো, নিজে গিয়ে পুলিসকে জানাও, তবে বলি মানুষের ব্যবহার। তা নয়, চাপা দিয়েই তুমি ঝড়ের বেগে বোঁ বোঁ করে পালিয়ে যাচ্ছিলে। পাবলিক ইঁটিয়ে ভাঙবে না সে গাড়ি? মেয়েটার কি হল তা তেমন লক্ষ্য না করুক, গাড়িখানাকে অচল করেছে।

অতএব পলায়ন-তৎপর আসামীকে বাধ্য হয়েই নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে ছুটে আসতে হয়েছে। ভাগ্যিস লক্ষ্যস্থলটা কাছাকাছিই পড়েছিল।

এঞ্জিনিয়ার বিভাসকমলের কারখানার অফিসের ছুটি সপ্তাহের মাঝখানে একদিন, কাজেই সুলেখাকে জামাই নেমন্তন্ন করতে হয় সেই দিন বুঝে। শ্বশুর-জামাই মোলাকাৎ কমই হয়। অবশ্য তাতে উভয় পক্ষেরই স্বস্তি। একই আকাশে দুই সূর্য পৃথিবীর পক্ষে সুবিধের নয়। সুলেখা এতে পরম শান্তি পান, সুলেখার জামাইও।

সেই নির্মল শান্তি নিয়ে মধ্যাহ্নভোজটা সম্পন্ন করিয়েছেন সুলেখা, দুই মেয়ে, দুই নাতিনাতনী ও জামাই এবং পুত্রবধূকে নিয়ে। বিশ্রামান্তে তিন মহিলাকে নিয়ে বিভাসকমল ব্রীজের আসরও বসিয়েছে কিছুক্ষণ, অতঃপর চায়ের টেবিল থেকে উঠে বলেছে, 'আচ্ছা, একটু ঘুরে আসি।'

'ঘুরে আসি' কথাটার মানে আর কেউ না বুঝুক রীতার বুঝতে বাকি থাকেনি। রীতা তো জানে বিভাসের মৌতাতের সময়টি কখন।

তবু রীতা সেই জানাটা ব্যক্ত না করে অবোধের ভঙ্গীতে বলেছিল, 'কোথায় আবার ঘুরতে যাবে এখন?'

বিভাস বলেছিল, 'কোথাও না, এমনি। যা দারুণ খাওয়া হয়েছে, একটু চক্কর না মারলে নামবে না।

সুলেখা সর্বদাই জামাতা সম্পর্কে তটস্থ।

তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিলেন, 'তা যাও বাবা ঘুরেই এসো। রাত্রে তোমার শ্বশুরের সঙ্গে খেতে হবে, জানই তো কম খেলেই বকুনি খেতে হবে।'

এই রকমই করে ওরা।

রীতা, তার বর আর মেয়ে।

বিভাসকমলের ওই বে-বারের ছুটির সকালে মায়ের কাছে চলে আসে, দুপুরের চব্যচোষ্যর পালা মিটিয়ে, সমস্ত দিনটা কাটিয়ে রাত্রে বাড়ির কর্তার সঙ্গে দেখা করে, খেয়ে দেয়ে তবে ফেরে।

আজও তাই করছিল।

শুধু বিভাসের 'প্রয়োজনীয়' বস্তুটা সঙ্গে মজুত না থাকায়, বেরিয়ে পড়েছিল, অথবা বেরোতে হয়েছিল।…নইলে পরিবেশটা তো পরম সুখকরই ছিল। চিত্তবিনোদনের জন্যে তিন দিকে তিন তরুণী ঘিরে ছিল সারাক্ষণ, স্ত্রী, শালি আর শালাজ। শালাজের বরটি এখন অফিসের কাজে কালকাতা ছাড়া, তাই আপাতত বেকার।…ওই তিন তরুণী বাদে, মাথার উপর একজন মহিলা ছিলেন তোয়াজ করতে।

তাছাড়া—নিজেকে যতই বড় ভাবুক বিভাস, নিজের বাড়িতে এখনো শ্বশুরের বাড়ির মত আরাম আয়াসের আয়োজন করে উঠতে পারে নি। এ বাড়িতে নিজেকে বিছিয়ে দিলে, যেন নবাব নবাব লাগে নিজেকে।

দরকারি বস্তুটা সঙ্গে থাকলে আর বেরোতে হত না, কায়দা করে কিছুক্ষণের জন্য নির্জন অবকাশ সৃষ্টি করে নেওয়া যেত। যেমন যায় প্রায়ই। প্রায় প্রতি বুধবারেই তো শ্বশুরবাড়ি নেমন্তন্ন খেতে আসে বিভাসকমল আর এ যুগের সব মেয়ের মতই রীতা বাপের বাড়িতে।

বিকেলের দিকে বাচ্চা দুটোকে নিয়ে চাকর নীচেয় নামে,

দীপক ম্যানসনের ছিমছাম কম্পাউণ্ডে।···যেখানে বাচ্ছাদের জন্য একটা দোলনা টাঙানো আছে, আছে একটা চরকি, যেটা নাগর-দোলা জাতীয়।

ওরা চলে গেলে মহিলারা কোন না কোন ছুতোয় সরে পড়েন জামাইকে 'অবকাশ' দিতে।

আজই তার ব্যতিক্রম হল।

রীতা বুঝেও দুষ্টুমি করে বলেছিল, 'তা সুন্দরী শালীটাকে পিঠে নিয়ে চক্কর খেয়ে এসো না! বেচারী এমনই হাঁদা যে, আজ পর্যন্ত সওয়ার হবার মত একখানা পিঠ যোগাড় করে উঠতে পারল না।'

নীতা বলে উঠেছে, 'নাই যখন পেরেছি, বাড়ি বসে বরং আকাশের পাখি গুনব, পরের জায়গা দখল করতে যাব কেন?'

বিভাসকমল ঘোরালো হাসি হেসে বলেছিল, 'প্রস্তাবটা তোমার দিদি এমন লোভনীয় করেছিল যে হৃদয় নেচে উঠেছিল, কিন্তু এখন দেখছি আগে থেকে ষড়যন্ত্র করেই প্রস্তাব করা। জানেন যে তুমি রাজী হবে না।'

রীতা বলেছিল, 'দেখ কমলবাবুর কায়দা। তোকে দুবার খোসামোদ করবে তো তা নয়—ধরেই নেওয়া হল তুই যাবিই না।'

বিভাসকমল হাসতে হাসতে বেরিয়ে গিয়েছিল। কে জানত তার কিছুক্ষণ পরেই এরকম ঝড় উঠবে।

রীতা অভয় দিয়েছিল স্বাতীকে, বলেছিল বিভাস বেরোবে না, তবু সুলেখা জামাইকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন।

সুলেখা বললেন, 'ওরা সব ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে আছে—'

বিভাসও প্রায় সেই রকমই হয়ে উঠেছে, তবু ভীষণ গলায় বলল, 'সেই জন্যই ক্ষ্যাপা কুকুরের ট্রিটমেন্ট করতে চাইছি ওদের। বন্দুকটা চাই আমার।'

কিন্তু সুলেখা তো পাগল নয়।

যতই তিনি 'জামাতা-ভীত' হন, মাথাটা হারিয়ে ফেলেননি,

তাই একটু পরে প্রায় উদভ্রান্তের মত হয়ে এসে বললেন, 'বাবুর' দেরাজের চাবিটা কোথায় জানিস নীতা ? আমি তো কোথাও'—

হাঁ, এখন আপাতত এই কৌশলটাকেই কার্যকরী মনে হল সুলেখার।

নীতা অবশ্যই মা-র এই কৌশলটা অনুধাবন করল। কারণ 'বাবার চাবি' বলে কোন জিনিস এ বাড়িতে নেই।

তবু নীতা অবোধের ভানে বলল, 'বাবুর দেরাজের চাবি ? আমি তো কোনদিন চোখেও দেখিনি। কোথায় যে রাখে বাবু—'

কৌশলটা এ বাড়ির সকলেই বুঝল।

রীতা, স্বাতী, এমন কি অন্তরালবর্তী যতীনও।

এরকম ঘোরালো অবস্থায় যতীন এই জরুরী বৈঠকের কাছে-পিঠে না থেকে বাচ্ছাদের আগলে বসে থাকবে, এমন তো হতে পারে না! সকলেই বুঝল, তবে বিভাস বুঝল না।

বিভাস মনে করল বন্দুকের নিরাপত্তা স্মরণ করেই হয়তো বিবেচক শ্বশুর চাবিটা নিজের এক্তিয়ারে রেখে থাকেন।

অতএব বিভাসের অসহিষ্ণু স্বর কেটে পড়ল, 'ফোনে জেনে নিন। বাড়ির বাইরে নেই নিশ্চয়।'

'ও আচ্ছা—'

সুলেখা আবার অভিনয়ে নামেন, 'ও নীতা, চট করে জিগ্যেস কর না বাবুকে, দেরাজের চাবিটা কোথায়—'

নীতা বলল, 'ফোন এই তো করলাম, শুধু বেজে গেল।'

'শুধু বেজে গেল ? এক্ষুণি অফিস বন্ধ হয়ে গেছে ?'

সুলেখা আরো আকুল, আরো বিশ্বস্ত, 'এত শীগগির তো বন্ধ হয় না ? তুই আর একবার করে দেখ নীতা।'

এখন বিভাসের মনে হল, চেষ্টাটা বোধহয় ঠিকমত হচ্ছে না। কিছু গলতি রয়েছে। বিভাস নিজেই সরে এল। বজ্রমুষ্ঠিতে রিসিভারটা তুলে, কড় কড় শব্দে ডায়াল করে, রিং না হতেই হ্যালো হ্যালো শুরু করে দিল।

না, সত্যি বেজেই যাচ্ছে বটে।

বিভাস ভীষণ মুখে বলল, 'ডুপ্লিকেট চাবি নেই ?'

রীতা সরে এল। বলল, 'না। এ বাড়ির কোন চাবিরই ডুপ্লিকেট নেই, সব হারায়।'

'ও। আচ্ছা। ঠিক আছে। পুলিস স্টেশনে করছি—'

রীতা এসে ওর হাত চেপে ধরল।

গম্ভীরভাবে বলল, 'পুলিস এলে সবার আগে তোমাকেই ধরবে।'

বিভাস কি জানে না এসব ?

কিন্তু শুধু বসে বসে গালাগালি শুনবে ? অসহিষ্ণুতা দেখাবে না ? অস্থিরতা দেখাবে না ? গায়ে মানুষের চামড়া নেই তার ? ধমনীতে অভিজাতের নীলরক্ত প্রবাহিত হচ্ছে না ?

কী বলে চলেছে ওরা, শুনতে পাচ্ছে না এরা ? পাচ্ছে বৈকি, নইলে সুলেখা কানে হাত চাপা দিচ্ছেন কেন ?

নীতা মাথায় হাত ঠেকিয়ে ?

স্বাতীই শুধু এখন চলে গেল বাচ্ছা দুটোকে দেখতে। অগত্যা যতীনও। বৌদির দৃশ্যগোচরে তো আর ড্রইংরুমের জানালায় আড়ি পাতা যায় না।

সুলেখা ভেবে অবাক হচ্ছেন এই উনচল্লিশটা ফ্ল্যাটের একজনও এই অসহায় অবস্থাটার প্রতিকারের চেষ্টায় এগিয়ে আসছে না কেন ? এদের মধ্যে অনেকেই রীতিমত পদস্থ আছেন, একটা ফোন করলেই পুলিসের গাড়ি চলে আসবে। অথচ কেউ যে সেই অনাথের নাথ, অগতির গতি, বিপদগ্রস্তের মধুসূদন পুলিসকে ডাকছে না তাতো বোঝাই যাচ্ছে। ভেবে কূল পাচ্ছেন না, রঞ্জিত মিত্রের বাড়ির প্রতি এই জঘন্য অসম্মান কি করে বরদাস্ত করছে সবাই— অন্ততঃ মিস্টার চ্যাটার্জি, মিস্টার বাসু, মিস্টার কাউল, মিস্টার পট্টনায়ক আর মিসেস রহমান।

এঁরা শুধু যে রঞ্জিত মিত্রদের বিশেষ বন্ধুই তা নয়, বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্নও।…তাছাড়া ওরা তো তিনতলা চারতলার, ওরা জানালা খুলে চেঁচিয়ে ধমক দিতে পারছে না!

সুলেখার তো মনে হচ্ছে নিজের হার্টের অসুখের ছুতো করে কেন মরতে আমি আবেদন নিবেদন করে একতলার ফ্লাটটা নিয়েছিলাম।…একতলা বলেই না এত ভয়।

জন-কল্লোলও জল-কল্লোলের মতই মাঝে মাঝে স্তিমিত হয়, মাঝে মাঝে তেড়ে ওঠে, এক্ষেত্রেও তাই হচ্ছিল। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল এবার বোধহয় ওদের এনার্জিতে ভাঁটা পড়ল, এবার বোধহয় চলে যাচ্ছে—আবার পরক্ষণেই ভীমরোলে শালার চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে জুতো বানাবার, মেরে তক্তা বানাবার, মাটিতে পুঁতে ডাল-কুত্তা দিয়ে খাওয়াবার এবং জিভ ছিঁড়ে নেবার সাধু ইচ্ছা ব্যক্ত করছে।

ক্রমশঃ বাড়ির লোককেও যা-তা বলছে।

সুলেখা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছেন, এই এতগুলো ভদ্র ব্যক্তির সমক্ষে রীতাকে বলা হচ্ছে 'পিঠ-সওয়ার বিবি', নীতাকে বলা হচ্ছে 'রঙ্গিলা রূপসী', সুলেখাকে বলা হচ্ছে 'জামাই-সোহাগী ধাড়ি ঘুঘু—' ইত্যাদি।

ঘণ্টা কয়েক আগে কেউ কল্পনা করতে পারত!

একবার সুলেখা আর্তনাদ করে উঠলেন, 'নীতা, কেউ কিছু বলছে না কেন?'

নীতা চোখ তুলে তাকিয়ে আস্তে বলল, 'বলবে কেন? বরং এন্‌জয় করছে।'

'এন্‌জয় করছে?'

সুলেখা আহত গলায় বলেন, 'আমাদের এই অপমান লোকে এন্‌জয় করছে?'

নীতার বয়েস তার মা-র থেকে অনেক কম, পৃথিবী সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতাও অবশ্যই অনেক কম, তবু নীতা স্বচ্ছন্দেই বললে, 'পারে, করছে! করবেই। ঘটনাটা উল্টো হলে হয়তো আমরাও করতাম।'

'আমরাও করতাম!' সুলেখা আর একবার আর্তনাদ করে করে ওঠেন। 'তুই বলছিস কি নীতা, আমরা এই রকম নীতা?'

এখন রীতা মার দিকে তাকায়, গম্ভীর গলায় বলে, "করতাম বৈ কি মা! 'হয়তো' নয়, নিশ্চয়ই। এটাই মানুষের মূল স্বভাব। বাধ্য হয়ে যাকে নিজের থেকে বড় বলে মানতে হয়, কিংবা নিজের সমান বলে স্বীকার করে নিতে হয়, হঠাৎ তাকে রাস্তায় পড়ে মার

খেতে দেখলে, উল্লাস বোধ করবে, এটাই স্বাভাবিক। দেখবে—যার সঙ্গে তার কোন যোগসূত্র পর্যন্ত নেই, সে-ও সুযোগ পেয়ে দু'ঘা চাঁটিয়ে যাবে।”

সুলেখা এখন কান থেকে হাত নামিয়েছিলেন, কারণ বাইরের কল্লোল কিছুটা স্তিমিত মনে হচ্ছে। হয়তো বাড়তিরা যে যার নিজের কাজে চলে যাচ্ছে। দরজাটা কিছুতেই ভেঙে উঠতে না পারাও একটা কারণ।

এর মধ্যে—দীপক ম্যানসনের কেয়ার-টেকার জানিয়ে গেছে এরকম চালালে বাধ্য হয়ে তাকে স্টেপ নিতে হবে···সেই নেওয়াটা যে কি তা অবশ্য জানায়নি, তবে মালিককে জানানো, অথবা পুলিসকে খবর দেওয়া, দুটোর একটা হবে। অতএব বিক্ষোভ-কারীরা দরজার কাছ থেকে কিছুটা সরে গিয়ে গুঞ্জন করে পরামর্শ করছে। ওদিকে ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটেও গুঞ্জন।

এখন প্রায় সব বাড়িতেই বাড়ির বাইরে থাকা মানুষরা একে একে ফিরে এসেছে, বেপরোয়া আড্ডাবাজ তরুণেরা বাদে। অনেকের অনেক ভাষ্য—তবু এই গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে যে মন্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠছে, সেটা হচ্ছে রঞ্জিত মিত্তিরের ওই ডাঁটুস জামাইটার উচিত শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল। হঠাৎ জুড়িয়ে যাচ্ছে কেন?···

কেউ কেউ ধরে নিলেন, এই জুড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে 'টাকার খেলা' ঘটে গেছে কিনা। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে নেতা জাতীয় কারো সঙ্গে জানলা দিয়ে বা কোন ফোকর দিয়ে ভাব-বিনিময় হয়েছে কিনা।

যে সব গৃহভৃত্যরা অকুস্থল ঘুরে এসেছে তারা সবিস্তারে ঘটনা বিবৃতির সমান ভূমিকা লাভ করে জানা এবং অজানা তথ্য মিলিয়ে যে নিপুণ গল্পটি পরিবেশন করছে, তাতে শ্রোতাদের জানা হয়ে গেছে শশী মিস্ত্রীর মেয়েটার মাথাটা স্রেফ ছাতু হয়ে গেছে। এবং বডিটার কোন শেপ নেই।

ধিক্কারে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে সকলেই, শুধু একথা কারো মনে পড়ছে না, শশীর দোকানে গিয়ে একবার খোঁজ নেওয়ার দরকার

ছিল কি হল মেয়েটার, কোন হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে তাকে, কে নিয়ে গেছে।

শশী মিস্ত্রীর একটা ছোটখাটো দোকান আছে পাড়ায়। এই দীপক ম্যানসনের নানাবিধ ঝামেলা সামলায় সে।···ডাকলেই দোকান ছেড়ে চলে আসে লোকটা, এত ভদ্র। অনেক সময়ই ওই মেয়েটাকে শশীর দোকানে বসে থাকতে দেখেছে লোকে। ফুলো ফুলো গাল গোলগাল গড়নের মেয়েটাকে দেখে অনেকে এ মন্তব্য করেছে, 'ওরা কি খাইয়ে ছেলে মেয়েদের এমন চেহারাখানি বানিয়ে তোলে বাবা! আমাদের ঘরে তো—'

সত্যি, এঁদের ঘরে জন্মের আগে মাতৃগর্ভস্থিত কাল থেকে, এবং জন্মাবধি শিশুর পুষ্টির জন্যে যে সাধনা করা হয়, তাতো বলে বেড়ালে অবিশ্বাস্য, তথাপি লিকলিকে হাত, খটখটে পা, ফিনফিনে ছেলেমেয়েরই তো আধিক্য।

সে যাই হোক শশীর সেই মেয়েটার চেহারা অনেকেরই মনে পড়ল। আর সেই চেহারাটা পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেল বলে দুঃখও হল। ছোটদের কান বাঁচিয়ে বলাবলি করতে লাগলেন অনেকে। যদিও এ যুগের ছোটদের কান বাঁচানো একটা হাস্যকর প্রচেষ্টা।

হঠাৎ ওই স্তিমিত সাগরে আবার ঢেউ উঠল! আবার নানা রকম শব্দ শোনা গেল। যার মধ্যে থেকে টুকরো টুকরো আহরণ করে বোঝা গেল, রঙ্গমঞ্চে স্বয়ং রঞ্জিত মিত্রের আবির্ভাব ঘটেছে, এবং তাঁর গাড়ি ঘেরাও করা হয়েছে। যাক, আর একটা মুখরোচক খাদ্য তাহলে পাতে পড়ল। এখন আর ইঁট ছোঁড়ার আশঙ্কা নেই, কাজেই দোতলা তিনতলা চারতলার জানলা অবারিত খুলে গেল। একতলাদের এক পাটি। যাতে হঠাৎ বেগতিক দেখলে তাড়াতাড়ি বন্ধ করা যায়।

কর্মস্থল ফেরত দু'একটা অকর্মস্থলে ঘুরে আসার অভ্যাস আছে রঞ্জিত মিত্রের। তবে কোন কোন দিন বলেন, অফিসে কাজ বেশী ছিল, আর কোন দিন বলেন, অন্য দরকার ছিল। বাড়ি

থেকে যদি ফোন করা হয় এবং জানা হয়ে যায় বেরিয়ে গেছেন অনেকক্ষণ সেদিনই এমন কথা ওঠে।

কিন্তু কেন? রঞ্জিত মিত্রের মত বাঘা ব্যক্তি কি তাঁর স্ত্রী-কন্যাকে ভয় করেন? না মোটেই তা নয়। ভয় নয়, ব্যাপারটা আলাদা। রঞ্জিত মিত্র নামের ব্যক্তিটি তাঁর 'নাম'টিকে বড় ভালবাসেন। অথবা 'নামী'-টিকে। সেই নাম অথবা নামীটি যাতে সকলের চোখে মধুর মোহন সুন্দর শোভন এক জ্যোতির্ময় মূর্তিতে প্রতিভাত হয়, এই সাধনা রঞ্জিত মিত্রের জীবনের সাধনা। ভিতরের গেঞ্জিটা ফুটোফাটা ময়লা নোংরা হোক, উপরের জামাটার কখনো ভাঁজ নষ্ট হতে দেন না।

ঘরে বাইরে সর্বত্র।

বিশেষ করে আবার সঞ্জিতের কাছে। সঞ্জিতের চোখ যেন বড় বেশী তীক্ষ্ণ, যেন উপরের ওই নিভাঁজ আবরণটা ভেদ করে ওর দৃষ্টি সেই ফুটোফাটা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

তাই রঙের তুলি বোলানোর দরকার আরো বেশী হয়। তবে অফিসের কাজে প্রায়ই তাকে বাইরে যেতে হয়, এই সুবিধে। হয়তো ওই যেতে হওয়াটার জন্যেই কৃতী ছেলে তার স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে এখনো বাপের ঠিকানায় বাস করছে, নাহলে করবার তো কথা নয়।

এখন সঞ্জিত কলকাতায় নেই, তাই রঞ্জিত মিত্র তাঁর নিজস্ব ঘোরাঘুরির কাজটার সময় কিছু বেশী দিয়ে ফেলছেন মাঝে মাঝে। আজও দিয়েছেন। গেটে ঢোকবার আগেই চাঞ্চল্যটা লক্ষ্য করলেন। তারপর বিক্ষোভকারীদের দেখলেন। এবং গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার?

হ্যাঁ, গাড়ি তিনি নিজেই চালান, নিজের গতিবিধি সম্পর্কে খবরটা তাহলে নিজের মুঠোর বাইরে যেতে পায় না।

অতএব মুখটা দেখা গেল রঞ্জিত মিত্তিরেরই।

পরক্ষণেই স্পষ্ট শুনতে পেলেন, না, ভুল-চুক কিছু নেই, স্পষ্টই শুনতে পেলেন, 'ওই যে এসে গেছে শালা বুড়ো।'

রঞ্জিত মিত্তির অবাক হয়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা

করলেন, কার সম্পর্কে বলা হল কথাটা, নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না। ভাবতে চেষ্টা করলেন, ঘণ্টা বারোর মধ্যে পৃথিবীতে কী এমন অঘটন ঘটতে পারে, যার জন্যে—

ভাবার সময় পেলেন না।

গাড়ি ঘেরাও হয়ে গেল, এবং কটূক্তি শুরু হয়ে গেল। তারা এখন দলে ভারী, এবং লোকটা এখন 'আসামী পক্ষের', অতএব নির্ভয়ে যা ইচ্ছে বলা যায়। সব সময় 'কেঁচো' হয়ে থাকতে বাধ্য হওয়ার একটা প্রতিক্রিয়া নেই? কিন্তু রঞ্জিত মিত্তির তাঁর জামাই বিভাসকমলের মত হাঁদা নয় যে, কটূক্তি শুনে বন্দুক খুঁজতে যাবেন। তিনি গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন।

হ্যাঁ, পড়লেন। মনুষ্য-চরিত্রে অভিজ্ঞতা আছে তাঁর, জনতা চরিত্রেও। একদা দীর্ঘকাল লেবার অফিসারের কাজ করতে হয়েছে তাঁকে। এটা জানেন তিনি এতগুলো লোক যখন একসঙ্গে দল পাকিয়ে কিছু করতে আসে, তখন চট করে প্রতিপক্ষকে ছুরি মেরে বসে না।

তবু সতর্কতা নিলেন। যদিও গাড়ি ঘেরাও, তবু ওদের গা ঘেঁষেই—নেমে এলেন। আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে দু'হাত তুলে দাঁড়ালেন, শান্ত স্থির গলায় বললেন, 'ব্যাপারটা তো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ভাই! আমায় একটু বোঝাতে হবে।'

এই শান্ত আত্মসমর্পণে কিছু কাজ হল। দু' একজন মুখপাত্র হয়ে এগিয়ে এসে উত্তেজিত ভাষায় 'ব্যাপার' বুঝিয়ে দিল।

শুনে রঞ্জিত মিত্র যেন বিদ্যুৎ-আহত হলেন। ওই ছেলেটার কাঁধ চেপে ধরে বলে উঠলেন, 'বলছ কি ভাই? আমাদের শশীর ওই মেয়েটা?'

যদিও এই মুহূর্তে শশীর 'সেই' মেয়েটাকে মনে মনে সনাক্ত করতে পারছেন না রঞ্জিত মিত্তির, তবু করাটাই সঙ্গত বলে মনে করলেন। তারপর রগ টিপে ধরে বললেন, 'ভাবতে পারছি না ভাই, ভাবতে পারছি না।'

এদের সঙ্গে এভাবে 'ভাই' বলেই কথা বলেন রঞ্জিত মিত্তির, যখন এরা চাঁদা চাইতে আসে, অথবা পাড়ার পুজোয় প্রেসিডেণ্ট

হতে অনুরোধ করতে আসে। বলেন, 'বুঝি ভাই, পাড়ায় এই পুজোয় আমার আরো বেশী চাঁদা দেওয়া উচিত, কিন্তু মুসকিল কি, কর্তব্য যে ঘরের বাইরে। যেখানে খেটে খাই সেখানেও যে অনেক দাবি মেটাতে হয়। ওদের আবার ভাগে ভাগে পুজো।'

আর অন্য প্রস্তাবে হাতজোড় করে বলেন, 'ওইটি বোলনা ভাই, ওইটি মাপ করতে হবে। আমি যাব, প্যাণ্ডেলে বসে থাকব, ঠাকুর দেখব, সবই করব, কিন্তু প্রেসিডেণ্ট হয়ে উচ্চাসনে বসতে পারব না, এখানে অনেক উপযুক্ত ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা হয়তো এতে খুশীই হবেন –'

এমনি 'ভাই' দিয়ে মধু ঢেলে কথা বলাই তাঁর অভ্যাস। এই ছেলেরাই সবাই যে সেই ছেলেরা তা নয়, নতুনও আছে, অনেকে আছে। সেই নতুন আর অনেকে প্রায় মুগ্ধ হয়ে গেল।

শশী মিস্ত্রীর মেয়ের 'অপঘাত' মৃত্যুর কথা বেশ কিছুক্ষণ ভাবতে পারলেন না রঞ্জিত মিত্তির. রগ টিপে দাঁড়িয়ে থাকলেন গাড়িতে ভর দিয়ে, তারপর হঠাৎ সতেজে বলে উঠলেন, 'তা তোমরা পুলিসে খবর দাও নি?'

পুলিসে!

এখন মুখ চাওয়া-চাওয়ির পালা।

কারণ পুলিসে খবর দিয়ে তারা এতটা রোমাঞ্চ থেকে বঞ্চিত হতে চায়নি, কিন্তু রঞ্জিত মিত্তিরের উত্তরপ্রার্থী মুখের দিকে তাকিয়ে সে উত্তর তো আর উচ্চারণ করা যায় না!

তাই একজন চট করে বলে ওঠে, 'পুলিসের কথা বাদ দিন।'

কেন বাদ দেবেন, সে কথা এখন উহ্য। বাদ তো দেওয়া হোক, যাতে পূর্ব ত্রুটি সম্পর্কে যুক্তি ছাড়া করবার একটা সময় পাওয়া যায়।

রঞ্জিত মিত্তির যতগুলো মুখ দেখতে পেলেন, সবগুলোর দিকে তাকিয়ে গভীর বেদনার্ত গলায় বললেন, তা বটে। আমাদের জাতীয় পুলিসকে নিয়ে অনেক সময়ই আমরা গৌরব করতে পারি না। তবে অপরাধীর শাস্তি চাই তো!

হঠাৎ উদাত্ত হয়ে বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ চাই। যদিও এতবড় জঘন্য

অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি আমার জানা নেই। অ্যাঁ, ভাবতে পারা যায় যে একটা কচি বাচ্ছাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল সে! এত বড় অমানবিকতা! উঃ! আমি বলছি না অ্যাকসিডেণ্ট কেউ ইচ্ছে করে ঘটায়, অ্যাকসিডেণ্ট অ্যাকসিডেণ্টই। হয়তো এই রঞ্জিত মিত্তিরই কাল তেমন কাজ করে বসতে পারে, তবু বলব —গাড়ি চালাতে আরো অনেক বেশী সতর্কতা নেওয়া উচিত। সেই উচিত কাজ এই আসামী করে নি। হ্যাঁ হ্যাঁ আসামীই, এখন আমি আমার জামাইকে একটা জঘন্যতম আসামী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না। অমানুষ হৃদয়হীন কাপুরুষ। মনে হচ্ছে আমার নিজে গিয়ে থানায় খবর দেওয়া উচিত, যখন সেই অপরাধী আমারই বাড়িতে আত্মগোপন করে রয়েছে। কিন্তু বুঝতেই পারছ ভাই, এর মধ্যে আমার মেয়েটার সুখ-দুঃখ জড়িত। হয়তো এরপর সে তার বাপকে ক্ষমা করতে পারবে না। তাই বলছি—তোমরাই চলে যাও, প্রকৃত কথা বলে, ন্যায় আর সত্যের হয়ে আর্জি করগে—'

জনতা যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

যেন মঞ্চে বক্তৃতা শুনছে, অথবা রঙ্গমঞ্চে উচ্চমানের সংলাপ। সাপের ফণার উপর যেন ধুলোপড়া ছড়ানো হচ্ছে।

কেউই বলে উঠল না, 'আচ্ছা যাচ্ছি'।

থানায় ডায়েরী করতে যাওয়া সহজ নাকি। প্রত্যক্ষদর্শীদের নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করবে না? আসামীর থেকে বেশীই করবে হয়তো।

রঞ্জিত মিত্র মনে মনে হাসলেন।

রঞ্জিত মিত্র আরো বেদনাবিধুর হাসলেন, 'বুঝতে পারছি অপরাধী আমার জামাই, আমার একমাত্র জামাই বলে (এইখানে গলাটা একটু কাঁপল) তোমরা দ্বিধা করছ, কুণ্ঠিত হচ্ছ, তবু বলব, দ্বিধা ত্যাগ করা দরকার। আমি দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছি না, আমি একান্ত ভাবে চাইছি, ওর শাস্তি হোক। কিন্তু তোমরা যদি সে ভার না নিতে পারো, তবে তোমাদের এই জনতার আদালতে তাকে এনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি। তোমরা তাকে যা শাস্তি দিতে চাও দাও। আমার মনে হয় শশীকেও ডাকা উচিত এখানে।'

এতখানি জীবনে রঞ্জিত মিত্তির যতবার না 'উচিত' শব্দটি ব্যবহার করছেন, এখন এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তা করলেন।

শশীর নাম শুনে কেউ অস্ফুট মন্তব্য করল, যার অর্থ হতে পারে তাকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে? সে কি এখন দোকান খুলে বসে আছে?

রঞ্জিত মিত্তির বললেন, 'শশীকে পাওয়া যাবে না বলছ?'

'না, মানে দোকানে তো নেই--' বলল একজন, 'হয়তো হাসপাতালেই আছে।'

মিত্তির বললেন, 'রাইট্! তাহলে আমাদের সেইখানেই যেতে হবে, অন্ততঃ তার কাছে জানতে চাইতে হবে, সে কী শাস্তি চায়। তার শোকার্ত আত্মা কী বলে। আমিই জানতে চাইব, তোমরা কেউ একজন আমার সঙ্গে চলো—' চলো! চলো মানে। শুনে হতভম্ব হয়ে গেল সবাই, কোথায় চলো! কোন হাসপাতালে গেলে শশী মিস্ত্রীর মেয়ের সন্ধান পাওয়া যাবে সেটা আবার কে জানে।

রঞ্জিত মিত্তির এখন সাপদের ঝাঁপিতে পুরে এনেছেন, শেষ ধুলোপড়াটা ছুঁড়ে মারেন। কোথায় দিয়েছে তাকে? পি জি-তে? শম্ভুনাথে? না কি বাঙড়ে?'

প্রত্যাশী দৃষ্টি, বেদনায় কোমল, আত্মধিক্কারে ম্লান। এখন একটা জুলফিওলা ছেলে সাহস করে এগিয়ে এসে বলল, 'আমরা স্যার গাড়িটা আটকাচ্ছিলাম কারা যেন লাশ তুলে নিয়ে গেল, দেখিনি। এইমাত্র যে 'শালা' বলছিল ভুলে গেল।

'ওঃ! তাহলে তো মুশকিল!' রঞ্জিত মিত্তির বললেন, 'ঠিক আছে, আমি সম্ভাব্য সব জায়গায় ফোন করে করে জেনে নেব। সময়টা কত ছিল?'

'আজ্ঞে, ইয়ে সাড়ে ছ'টা সাতটা।'

রঞ্জিত মিত্তির ফট, করে গাড়ির মধ্যে হাত চালিয়ে অফিস-ব্যাগটা টেনে নিয়ে তার ভিতর থেকে একটা নোটবুক গোছের, আর একটা পেন বার করে লিখে নিলেন কিছু, বোধহয় সময়টাই।

তারপর চোখ তুলে বললেন, 'তোমরা যারা স্বচক্ষে দেখেছ, তাদের নামগুলো একটু জেনে নিতে হবে যে—'

ওরা আবার মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল।

পিছন দিক থেকে ভীড় পাতলা হতে থাকল।

'কি বল ভাই। অন্ততঃ দু' চারজনের তো নাম চাই। নইলে আমার তো জেরা করবে। আমি কোথায় ছিলাম তখন। আমি দেখলাম কী করে। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে যাদের কাছে জেনেছি, তাদের নামটা তো চাই। তাছাড়া—'

রঞ্জিত সেই পেনটা নিয়ে নোটবুকে আরো কি যেন টুকতে টুকতে বললেন, 'তাছাড়া জামাইয়ের ওই পক্ষীরাজটি, ওটা তো আবার ইন্সিওর করা আছে, জখম হওয়া জিনিসটাকে দেখাতে হবে। কী—ইয়ে—মানে পরিস্থিতিতে এরকমটা হয়েছে বোঝাতে হবে তো তাদের। রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখলাম বটে তা তখন তো জানিনা জিনিসটা কার। যাই হোক অন্ততঃ দু' একজন প্রত্যক্ষদর্শীর নাম দিতে না পারলে তো—'

এ আবার কি ফ্যাসাদের কথা! লোকটা বলে কি! হাস-পাতালে খোঁজ নিতে গেলে এত সব লাগে নাকি? ওরা তখন সরে পড়ার ভঙ্গী নিয়ে বলে, 'আচ্ছা স্যার আমরা বরং খোঁজ নিয়ে দেখছি কোন হসপিটালে—মানে শশী তো জানে। ঝাঁপিয়ে এসে পড়েছিল তো, এখানের ইলেকট্রিসিয়ান বাবুরা বোধহয় শশীর বাসা চেনে।'

'ঠিক আছে।' রঞ্জিত মিত্তির বলেন, 'তাহলে তোমরা যত তাড়াতাড়ি পার ওই খবরটা আমায় এনে দাও ভাই। অন্ততঃ খরচপত্রের জন্যে কিছু টাকাকড়ি তো দিয়ে আসতে হবে। গরীব বেচারা! আর যদি একেবারে শেষ হয়ে গিয়ে না থাকে তাহলে যত টাকা লাগে, যে রকম ট্রিটমেণ্টের দরকার হয়—'

রঞ্জিত মিত্তির একটু থেমে চশমা খুলে রুমাল দিয়ে মুছে, আস্তে আস্তে বলেন, 'ঈশ্বর যেন আমায় সেই প্রায়শ্চিত্ত করতে দেন।'

ওরা অবাক হয়ে তাকায়।

অগ্রণী ছেলেটি সহানুভূতির গলায় বলে, 'আপনার আর দোষ কি স্যার ?'

মিত্তির গভীর ভারাক্রান্ত গলায় বলেন, 'দৃশ্যতঃ হয়তো নেই। কিন্তু আমার নিজের কাছে ? আমার বিবেকের কাছে ? যাক, তোমরা এসো, আমি দরজা খুলিয়ে ওকে তোমাদের কাছে ধরে দিই। তোমরা যদি ওকে ধরে মারো তাহলেও আমার কিছু বলবার থাকবে না।'

যারা বহুক্ষণ ধরে সেই পাপিষ্ঠ পাতকের চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে জুতো বানাবার সংকল্প ঘোষণা করেছিল, ঘোষণা করেছিল পিটিয়ে তক্তা বানাবার ; তারা ব্যস্ত হয়ে বলে, 'থাক, ও আপনিই যা করবার করবেন।'

'আমিই ?'

সহসা একটু হেসে ফেললেন রঞ্জিত মিত্তির, মধুর মোহন হাসি। বললেন, 'আমি কি আমার জামাইকে ধরে ঠ্যাঙাতে পারব !'

ওরাও তৎক্ষণাৎ বিগলিত হাস্যে বলে ফেলল, 'তা আমরাই কি পারব স্যার ?'

বলেই ভেবে নিল, ইনি তো আর তখন ছিলেন না। আর বন্ধ জানলার ওপার থেকে যে সব কথা গিয়ে পেঁাছেছে, তাদের বক্তাদের তো কেউ দেখতে পায়নি। পরে কথা উঠলে বলতে পারা যাবে, তারা স্যার বাইরের লোক, যত লোফার লক্ষ্মীছাড়া এখানে এসে ভীড় করে ঝামেলা বাড়াচ্ছিল।

মিনিট খানেকের মধ্যে এসব ভাবা হয়ে গেল। সেই মিনিট খানেক সময় মিত্তির খুব ভাবুকের মত কপালে আঙুল ঘষছিলেন। তারপর তিনি বললেন, 'তা বটে। সত্যি সে তোমরা পারবে না। যদিও এরকম ভয়ংকর একটা কিছু হওয়া দরকার ছিল তার।·· যাক, অন্ততঃ তাকে একবার ডেকে দিই তোমাদের সামনে, ঘাড় হেঁট করে ক্ষমা চেয়ে যাক। না না, নিজের লোক বলে ইয়ে করব না আমি। ক্ষমা তাকে চাইতেই হবে। এতবড় অন্যায় করে পার পেয়ে যেতে পারে না।'

যেন এরাই ন্যায়ধর্মের ধারক-বাহক, আইনের মালিক।

কিন্তু একথা শুনে ন্যায়বিচারকদের মুখ শুকিয়ে ওঠে। ওরে সর্বনাশ! ইতিপূর্বে যা যা বলেছে, পরে তার জবাবদিহি করতে হলে যে উত্তর দেওয়া যাবে ভেবেছিল তা গুলিয়ে গেল। ভাবল যা কিছু বলা হয়েছে তার শতাংশের একাংশও কি কানে যায়নি তার? তাই গেলেই তো যথেষ্ট। তখন আবার ক্ষমা চাওয়ার পাত্র না বদল হয়ে যায়।...তাছাড়া জানলার নীচে ভাঙা ইঁটের সাক্ষ্য নেই? এঁর যা মতিগতি হয়তো শেষ পর্যন্ত পুলিসেই খবর দিয়ে বসবেন, জামাই বলে মানবেন না, হয়তো জামাই ব্যাটাকে সুচক্ষে দেখেন না, নেহাত জামাই বলেই সয়ে যান, এখন একটা সুযোগ পেয়ে—

তা পুলিস এলেই তো উল্টো উৎপত্তি।

তারা নিজেরা রক্ষক হয়ে ভক্ষক হলেও ক্ষতি নেই, পাবলিক নিজের হাতে আইনটি তুলে নিলে আর রক্ষে নেই। দোষীর সাজা ছেড়ে তাদেরই সাজা দিতে বসবে। জানলায় ইঁট মারা গাড়ি ভাঙা, এগুলো তো জ্বলন্ত সাক্ষ্য।

তাই তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'না না, থাক থাক।'

বলতে বলতে জায়গাটাকে যেন ফর্সা করে দিয়ে চলে গেল।

রঞ্জিত মিত্তির সেই ফর্সা হয়ে যাওয়া জায়গাটার দিকে একটা অদ্ভুত হাসির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে যৌবনোচিত ভঙ্গীতে গাড়ীটায় উঠে বসে স্টার্ট দিয়ে ম্যানসনের পিছন দিকে যে সারি সারি গ্যারেজ আছে তারই একটার লক্ষ্যে পাশের প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে গেলেন।

জানলায় জানলায় উৎকণ্ঠিত দর্শকদল ব্যাপারটার সঠিক মানে বুঝল না। গাড়ি ঘেরাওয়ের পর কিছুই হল না দেখে ক্ষুণ্ণ হল, তবে আরো ক্ষুণ্ণ হল নিজেদের দ্বিধায়। এ সময় নেমে বেরিয়ে এলে, অথবা ছেলেদের দু' একটা কথা বলতে পারলে দু'টো ব্যাপার হত।...এক হচ্ছে—ঘটনাটা এমন নিঃশব্দে ঠাণ্ডা মেরে গেল কেন তা জানা, আর দুই হচ্ছে—রঞ্জিত মিত্তিরের কাছে ভবিষ্যতে মুখ থাকা।

এইটাতে আবার রিপুকর্ম করতে হবে এটা ওটা বলে। অপরটা অনুমান করে করে বুঝতে চেষ্টা করল কিছু। অতক্ষণ ধরে রঞ্জিত মিত্তির ছেলেগুলোকে কি এত বোঝাতে পারেন? শুধু মুখের কথা খরচ করে এত সহজে এমন বোঝানো যায় যে ওই উত্তালদের তালে এনে ফেলা যায়?

গাড়ি গ্যারেজ করে আঙুলে চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে সাত নম্বরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন রঞ্জিত। নিজের পকেটে ল্যাচ্‌কীর ডুপ্লিকেট থাকলেও সাধারণতঃ তিনি কলিং বেলটাই ব্যবহার করেন। গৃহকর্তার গৃহাগমনের ঘোষণা হিসেবেই হয়তো।

কিন্তু আজ আর তা করলেন না, আজ পকেট থেকে চাবি বার করে দরজা খুলে ভিতরে চলে গেলেন।

ঢুকেই প্যাসেজের বাঁ দিকে সারভেন্ট রুম ও ডানদিকে ড্রইংরুম। প্যাসেজ পার হয়ে অনেকটা জায়গা, যাকে বলা হয় ডাইনিং রুম-কাম-ড্রইংরুম। এই ড্রইংরুমটি হচ্ছে ঘরোয়া, পারিবারিক। এইখানেই চলে এলেন গৃহকর্তা, দেখলেন খাবার টেবিলে বাদু এবং মৌ ঘুম ঘুম চোখে বসে আছে, তাদের দুজনের পাশে পাশে দুজনের মা। বসবার দিকের সোফায় একদিকে নীতা আর সুলেখা বসে, আর একদিকে বিভাস, একখানা ছবি-বহুল ইংরেজি সাপ্তাহিকের পাতা ওল্টাচ্ছে। বাইরের গর্জন কিঞ্চিৎ স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পর সে 'বন্দুক বন্দুকে' আবদারটা বন্ধ করে, গেস্টরুমের ডানলোপিলোর গদি পাতা ডিভানে শুয়ে পড়েছিল, শ্বশুর এসে পড়া এবং গাড়ি ঘেরাওয়ের ঘটনা জেনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বইটা নিয়ে ওল্টাচ্ছে। ওল্টাচ্ছে তো ওল্টাচ্ছেই।

আসার নাম নেই প্রভুর।

এখন আর জানলার নীচে লোক না থাকায় নীতা আর স্বাতী একটা জানলা খুলে দৃশ্যটা অবলোকন করছিল। দেখল বাবু তাদের সঙ্গে কথা চালিয়ে যাচ্ছেন।···সুলক্ষণই বলতে হবে।

ওরা যখন প্রথমেই সবাই মিলে ওঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি,

তখন আর ভয় নেই। ব্যাপারটা যখন গড়িয়ে গেল, তখন জুড়িয়ে যাবে।···বাবাকে গাড়ি গ্যারেজ করতে যেতে দেখে ওরা জানালা ছেড়ে এসে বাচ্ছা দুটোকে নিয়ে টেবিলে বসিয়েছে।

ভিতরে ঢুকেই জামাইটাকে দেখে আপাদমস্তক জ্বলে গেল রঞ্জিত মিত্রের। একেই তো ওটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না, সুলেখার বাড়াবাড়ি জামাই আদর দেখে, আর জামাইয়ের উন্নাসিকতা দেখে। অভিজাতের ভঙ্গী এক, আর উন্নাসিকতা এক। অভিজাত হতে হলে মাথার রক্ত ঠাণ্ডা রাখার সাধনা করতে হয়। যে সাধনা রঞ্জিত মিত্তিরের আজীবনের। ওই বি. কে. ঘোষটি অর্থাৎ বিভাসকমল, ঠিক তার উল্টো। মাথার রক্ত তার সর্বদাই গরম।

তবে এখন রঞ্জিতের মাথার রক্ত টগবগ করে ফুটছিল।···বহু কৌশলে বাইরের ওই ফণা-ধরা গোখরোগুলোকে ঝাঁপিতে পুরে ফেলে চলে আসতে পারলেও নার্ভের উপর কম চাপ তো যায়নি।

যারা চিরকাল স্যার বলে এসেছে, এবং এখনো শেষকালে তাই বলে গেল, তারাই মাঝখানে হঠাৎ রঞ্জিতকে 'শালা' বলেছে।··· তবু তিনি জীবনের সাধনা থেকে চ্যুত হননি···এখনো ওই গোঁয়ার-মুখো বিভাসকমলকে ঘাড় গুঁজে মিথ্যে বইয়ের পাতা ওল্টাতে দেখে মাথার রক্ত টগবগিয়ে ফুটে উঠলেও সাধনা নষ্ট করলেন না।···ওই গোঁয়ারটাকে ঘাড় ধরে তুলে এনে চাবকে লাল করে দেবার দুরন্ত ইচ্ছাকে দমন করে, তার দিকে না তাকিয়ে খাবার টেবিলের দিকে তাকিয়ে খুব সাধারণ গলায় বলেন, 'কি ব্যাপার, এরা এত রাতে খাচ্ছে?'

বললেন টাইটা খুলতে খুলতে।

যেন কিছুই হয়নি, যেন উনি আজকের ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাতের খবর রাখেন না।···

একথার উত্তর বড়রা কেউই দিল না, রীতা আর স্বাতী দুই মা ওদের পাতের উপরই তখন ভয়ানক দরকারি কিছু দেখতে ব্যস্ত হল। উত্তর দিয়ে উঠল বাড়ির বাদু, বলল, 'বাঃ আজকে রাক্কোস আসেনি বুঝি? ওরা পিছে-কে মারতে আসেনি বুঝি? যতীনদা রান্না করতে দেরী করে না বুঝি?'

রঞ্জিত মিত্তির নাতির কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'ও বাবা! রাক্কোস! কি রকম দেখতে তারা?'

বাদু বলল, 'কি করে দেখব? যতীনদা দেখতে দিয়েছে? মা পিতি দিদু কেউ দিয়েছে? জানলা বন্ধ করে রেখেছিল না?'

'এহে হে! তাহলে তোমার আর রাক্কোস দেখা হল না,' রঞ্জিত মিত্তির এবার মেয়ের ঘরের নাতনীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'মৌ, তুমি কেন রাক্কোসদের মেরে দিলে না?'

মৌ ভারীমুখে উত্তর দিল, 'কি করে মারব? তুমি তো বন্দুক লুকিয়ে রেখে দিয়েছ। বাপী কি নিতে পেরেছে?'

রঞ্জিত এখন একটু থমকে তাকালেন। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন।

বিভাস একই অবস্থায়, সুলেখা মন দিয়ে একটা সেলাই না বোনা কি নিয়ে বসে আছেন। নীতা এমনি বসে বসে পা দোলাচ্ছে নির্বিকার নির্লিপ্ত মুখে।

রঞ্জিত কারো সঙ্গে কথা বললেন না, ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। এখন অ্যাটাচড্ বাথরুমে ঢুকে অন্তত মিনিট চল্লিশ ধরে স্নান করবেন, তারপর ধবধবে পায়জামা পাঞ্জাবি পরে জামাইয়ের থেকেও তরুণ ভঙ্গীতে এসে খাবার টেবিলে বসবেন।

রঞ্জিত যে বাইরে অতক্ষণ কাটিয়ে সব খবরাখবর জেনে এসেও একটা কথা বলবেন না, এটা কেউ ধারণাও করতে পারেনি। এসে ফেটে পড়বেন এইটাই নিশ্চিত করে বসেছিল সবাই, এবং সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের প্রশ্নের উত্তর সাজাচ্ছিল।

দুরকমই ভেবেছিল, এক—ওই পাজী, লক্ষ্মীছাড়া ছেলেগুলো কি কি উৎপাত করেছিল তা ভাল করে জানতে চাওয়া এবং তাদের সম্পর্কে উচিত ব্যবস্থা করার সংকল্প ঘোষণা করা, দুই—বিভাস-কমলের হঠকারিতার বিরুদ্ধে কিছু কটু কথা মন্তব্য করে পরবর্তী পদক্ষেপের পরামর্শ করা।...দু রকম উত্তর-প্রত্যুত্তরই ভাঁজা হচ্ছিল। অন্তত শাশুড়ী জামাই তো বটেই।...বন্দুক চাওয়াটা চেপে যাবার মতলব ছিল সুলেখার তো বটেই, নীতা, স্বাতী সকলেরই। শুধু নীতাকেই ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, মাঝে মাঝেই

খুব উল্টোপাল্টা কথা বলেছে সে। বাদু যে বন্দুকের কথা বুঝে বসেছিল একথা কে ভেবেছিল?···ছোট ছেলেদের বোঝার পরিধি কতখানি, সে জ্ঞান বড়দের নেই বলেই বড়দের অসতর্কতার সীমা-পরিসীমা থাকে না।

বিভাসকমল জ্বলছিল। শ্বশুর যদি তাকে এসে রাস্কেল ইডিয়ট অথবা মুখ্যু নির্বোধ বলে ধমকও দিতেন, তাহলে বোধকরি এত অপমান বোধ করত না সে। এই অগ্রাহ্য অসহ্য।

যখন বুঝল রঞ্জিত মিত্তির বাথরুমে ঢুকে গেছেন, তখন সহসা উঠে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে, 'মৌকে খাইয়ে নিয়ে তুমি খেয়ে নেবে তো নাও, এবার ফিরতে হবে। যথেষ্ট রাত হয়ে গেছে।'

ফিরতে হবে!

আজ যে আবার ফেরার প্রশ্ন আছে তা কে ভেবেছে।···সুলেখা তো একটু আগে রীতাদের অতি আধুনিক 'বাবু চাকর' অজিত কুমারকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন এরা আজ আর রাতে ফিরবে না, মৌ ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুলেখা বলেই এরকম একটা দুর্বল কারণ খাড়া করে চাকরের কাছেও সৌষ্ঠব রাখতে চেষ্টা করেছেন।···রীতা হলে বলতো 'অজিত, আমরা আজ আর ফিরছি না, তুমি বাইরের দরজা লক্ করে শুয়ে পড়ো।'

রীতা বলতে যায় নি বলেই সুলেখা।

বলেছেন আর ভেবেছেন, ভাগ্যিস ওই ডাকাতরা টেলিফোনের লাইন জখম করে দেয়নি।···তাও তো বলছিল 'দে শালার টেলিফোন লাইনটা কেটে।'

সুলেখা রিসিভারটা তুলে কানে চেপে ধরে বসেছিলেন অনেকক্ষণ। কখন হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। যায়নি।

এখন জামাইয়ের ঘোষণা শুনে সুলেখার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে এলো। বলে না উঠে পারলেন না, 'সেকি? আমি যে তোমার অজিতকে বলে দিয়েছি তোমরা ফিরবে না।'

বিভাসকমল গম্ভীর ভাবে বলল, 'না, যেতেই হবে।'

সুলেখা বললেন, ব্যাকুলভাবেই বললেন, 'কেন বাবা? এত রাত্তির হয়ে গেছে, গাড়ি নেই তোমার—'

'ট্যাক্সি আছে শহরে—'

'কিন্তু যাবার দরকার কি? শরীরে মনে অনেক ধকল গেছে, খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।'

'খাবার কথা বাদ দিন। খাবার অবস্থা নেই।'

'যাহোক কিছু তো খাবে।' সুলেখা তারপর আপন আশঙ্কা প্রকাশ করেন, তাছাড়া ওই গুণ্ডাগুলো এখন তো সুড় সুড় করে চলে গেল, ধারে-কাছে কোথাও ওৎ পেতে বসে আছে কিনা কে জানে।'

বি. কে. ঘোষেরও হৃদযন্ত্র কেঁপে উঠল না কি? উঠল। এ আশঙ্কা তার মনেও উঁকি ঝুঁকি মারছিল। তবু অহঙ্কার দেখিয়ে বলল, 'কি আর করা যাবে।…রীতা।'

রীতা মেয়েকে খাওয়ানো সেরে যতীনের হাতে দিয়ে দিচ্ছিল মুখ ধুইয়ে শুইয়ে দেবার জন্যে, তাকে চলে যেতে ইঙ্গিত করল। তারপর টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চাপা ব্যঙ্গের গলায় বলে উঠল, 'ইচ্ছে করে লোক হাসিও না কমল, এতই যদি সাহস, তখন এসে শেলটারে আশ্রয় নিয়েছিলে কেন?'

বিভাসকমল মুখটাকে বোদা করে বলল, 'ভুল হয়েছিল। সেটাই কারেকশান করতে যাব।'

রীতা চোখ কুঁচকে বলল, কারেকশানটা কি? ওদের হাতে খুন হওয়া?'

বিভাস রাগের গলায় বলে, 'তা তুমি তো তাই চাইছ।'

রীতা হঠাৎ হেসে উঠে বলে, 'শোন নীতা, তোর বিভাসদার কথা! ওর খুন হওয়া চাই আমি। আরে বাবা, তার মানে তো আমারও খুন হওয়া। তবে হ্যাঁ, দুচার বছর শ্রীঘর বাস হলে মন্দ হয় না।'

'রীতা, কী হচ্ছে কী?' সুলেখা রেগে উঠে বলেন, 'সব সময় তোর ওই কড়া ঠাট্টা ভাল লাগে না বাছা! দেখছিস বাবু এসে গেছেন—'

অবশ্য বাবু আসার সঙ্গে এটার সম্পর্ক কি তা বোঝা গেল না।

নীতা বলে উঠল, 'সবাই মিলে আর যাটামো করিসনে দিদি, খিদেয় মারা যাচ্ছি।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য খাওয়া হয়নি ওদের সে রাত্তিরে।

'ওৎ পেতে বসে থাকা'র ভয়টা বুকে তো হাতুড়ি পিটিয়েছে।

অতএব আবার সেই শ্বশুরের মুখোমুখিই হতে হল।

যথারীতি স্নান সেরে গলায় পুরু করে পাউডারের প্রলেপ লাগিয়ে ধবধবে পায়জামা আর দুধ-সাদা স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে প্রায় রাজকীয় ডাইনিং টেবিলটিতে এসে বসলেন রঞ্জিত মিত্তির।

এই জিনিসটি রঞ্জিতের শখের।

বাড়ির মাপের পক্ষে টেবিলটা বড়।

সুন্দর আর দামীও।

নিজের নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে পড়ে রঞ্জিত সাধারণ গলায় বললেন, 'কই, বিভাস বসল না?'

টেবিলে রীতা নীতা স্বাতী আসীন, সুলেখাও যে বসবেন তার আভাস দেখা যাচ্ছে তাঁর নির্দিষ্ট জায়গায় প্লেট দেখে।…তবে সুলেখা টেবিলে বসলেও, টেবিলের নিয়মটা যথোচিত মানেন না, সবাইকে পরিবেশন করে শেষের দিকে বসেন।

বাপের কথায় নীতা সংক্ষেপে বলল, 'বিভাসদার ক্ষিদে নেই।'

'কী আশ্চর্য, এমন ক্ষিদে নেই যে একটু বসবেও না? শুয়ে পড়েছে নাকি?'

'না, মৌ ঘুমুতে চাইছে না তাই আগলাচ্ছে।'

রঞ্জিত মিত্তির দরাজ গলায় ডাক দিলেন, 'বিভাস! এখুনি শুয়ে পড়লে কি হে? আরে কিছু তো খাবে। এসো এসো—'

সবাই অবাক হয়ে তাকাল।

অন্য দিনের সঙ্গে তো কোন পার্থক্য নেই গলার স্বরের। গুণ্ডাগুলো কি তাহলে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলেনি? বাদুর রাক্কোসের গল্পটা গল্পই ভেবেছেন।

গলার স্বর শুনে বিভাসও চমকিত হল। আবার যন্ত্রচালিতের মত বেরিয়েও এল ঘর থেকে।

রঞ্জিত স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সকালে এমন কি খাইয়েছ যে এবেলা আর খেতেই বসবে না ? জামাই আদর করবার সময় জুলুম করাটা ঠিক নয়। যাক, একেবারে না-বসাটা ঠিক নয়, অন্তত: চিকেনটা খাও একটু।'

সুলেখা জামাইকে মৌন দেখে সেটাকে সম্মতির লক্ষণ মনে করে কৃতার্থমন্যের মত তাড়াতাড়ি তার জন্যে ডিশ এগিয়ে দিলেন। দিলেন খাদ্যবস্তু।

বিভাস চেয়ারটা টেনে বসে, পুরনো সিদ্ধান্তের জের টেনে, বলে, 'খাবার ইচ্ছে ছিল না—'

রঞ্জিত মিত্তির সে কথার দিকে না তাকিয়ে বলেন, 'রীতা, তুইও তো খাচ্ছিস না ভাল করে—'

রীতা শান্ত ভাবে বলে, 'খাচ্ছি তো—'

বিভাসকমলের এখন মনে হয়, খাবার ব্যাপারে এতটা জবাব না দিলেই হত। ক্ষিদের খুব অভাব নেই। রঞ্জিত মিত্তিরের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর হয়তো তার পাকস্থলীকেও স্বাভাবিক অবস্থায় পেঁছে দিল। কিন্তু যাক প্রাণ, থাক মান, অতএব একটু নাড়াচাড়া করেই বলতে হয় 'আর পারা যাচ্ছে না।'

এখন রঞ্জিত মিত্তির বলে ওঠেন, 'অবশ্য না পারাই স্বাভাবিক, থাক, জোর করব না। আচ্ছা, মেয়েটা কি একেবারে স্পটেই শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হয় তোমার ?'

এ আবার কি ! এই ভাবে এই কথা !

টেবিলে যেন ভূমিকম্প হল।

বিভাসকমলের মুখের কাছে তোলা গেলাশ মুখ পর্যন্ত পৌঁছল না। পড়ে ভেঙে কেলেঙ্কারি বাড়ল না এই ঢের।

উত্তর দিল নীতা, অবশ্য প্রশ্ন করল, 'তোমায় ওরা সে কথা বলেনি বাবু ?'

রঞ্জিত মৃদু হাসির সঙ্গে বলেন, 'জানলে তো বলবে। সেটারঃ

কি হল কে দেখতে গেছে ? যেটা বেশী জরুরী সেটাই করেছে। আসামীকে ভাগতে দেয়নি।'

এটা যে কার সপক্ষে তা বোঝা যায় না, অথচ মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবের অভিব্যক্তি দেখবার সাহসও কারুর হয় না।

অতএব পরিবেশ স্তব্ধ।

রঞ্জিত বলেন, 'মুশকিল হচ্ছে কোন হসপিটালে নিয়েছে, তাও বলতে পারল না কেউ। কাল সকালে শশীর কাছে খোঁজ করে সঠিক জানতে হবে। স্পটে মারা না গিয়ে থাকে তো কিছুটা আশা আছে। না হলেই মুশকিল। বেঁচে থাকলে, ওর যথাসাধ্য ট্রিটমেণ্টর জন্যে মোটা টাকা ফাকা দিয়ে—'

রীতা এখন মুখ তুলে বলে, 'সোজাসুজি বল না বাবা ঘুষ দিয়ে--'

রঞ্জিত মিত্তির তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাঁর বড় মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'না, এটাকে তুমি ঘুষ বলতে পার না। তবে শেষ হয়ে গিয়ে থাকলে অবশ্য—যদিও এমন কেসও আমার জানা আছে, বাবুর হাতে চড় খেয়ে ঝিয়ের ছেলেটা মারা গেল, কেস উঠল, সেই ঝি নিজে এসে কোর্টে বলল, তার ছেলের মৃগীর ব্যামো ছিল, এমনি পড়ে গিয়ে মরে গেছে। তার আড়ালে কি ছিল বোঝ।'

রীতা আস্তে বলল, 'বুঝলাম বাবা! আরো অনেক কিছুই বুঝছি। তবে ভাবছি—আমার মৌকে যদি কেউ—'

'আঃ রীতা!'

সুলেখা প্রায় ধমক দিয়ে ওঠেন, 'তোরা কি মনে করিস যা মুখে আসে তাই বলে ফেলাই খুব বাহাদুরী! চুপ করে থাক তো!'

রীতা আস্তে বলে, 'চুপ করেই তো আছি মা সেই অবধি। বাহাদুরী দেখাবার সাহস থাকলে তো, ওরা যখন বলছিল 'খুনেটাকে বের করে দিন, তখনই তো দরজা খুলে দিতে পারতাম।'

রঞ্জিত মিত্তির মেয়ের আনত কঠোর মুখের দিকে তাকিয়ে

বলেন, 'দিলে খুব বুদ্ধির কাজ করা হত না। বন্দুকের কথাও যখন উঠেছিল তখন অবস্থা খুব সহজ ছিল না।'

'সহজ ?'

এখন সুলেখা মুখ খুললেন, বললেন, 'সহজই বটে। খুব ভাগ্য যে ছিলে না। ওই গুণ্ডারা নিজেদের—দোষের কথা কিছু বললনা তো ?'

'নিজেদের দোষের কথা ?'

রঞ্জিত সাহেব তাঁর বড় মেয়ের মত হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠলেন। অথবা ওঁর মতই ওঁর বড় মেয়ে হেসে ওঠে।

হেসে বললেন, 'নিজেদের দোষের কথা কাউকে বলতে শুনেছিস ? এই যে বিভাস, ও কি লোকের কাছে বলে বেড়াবে ওর দোষ হয়েছে ? সে যাক, যাতে পুলিস কেস না হয় সে চেষ্টা তো করতে হবে। প্রমাণ করতে হবে বাচ্চাটাই ছুটে গাড়ির সামনে পড়েছিল। আছে হাঙ্গাম। তবে সব কিছু নির্ভর করছে মেয়েটার অবস্থার ওপর।'

থামলেন একটু, পাত সাফ করে খেয়ে চির অভ্যাস মত এঁটো পাতের মাঝখানে আঙুল দিয়ে একটা সংখ্যা লিখলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অনায়াসে অবলীলায় বললেন, 'তবে এ যাত্রায় যদি কিছু টাকার ওপর দিয়েও যায়, ভবিষ্যতে একটু সাবধান হয়ো। বেশী ড্রিঙ্ক করে গাড়ি ফাড়ি চালানো ঠিক না।'

ভূমিকম্প নয়, সমস্ত জায়গাটার উপর একা বজ্রঘাত করে চলে গেলেন।

শশীর বৌ বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিল, 'ওরে মা রে! আমার সোনার যাদু, কোন পিচেশ কোন রাক্ষস তোর ওপর দে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল মা! ভগমান তাকে শাস্তি দেবে না ?'

শশী কাল সন্ধ্যে থেকে সারারাত এই বিলাপ শুনে এসেছে, এখন ভোরবেলা একটু তন্দ্রা এসেছে, আবার তার উপর এই কান্নার ঝাপট।

শশী উঠে বসে বিরক্ত গলায় বলে, 'ফের মড়া কান্না কাঁদছিস ? বলছি প্রাণে বেঁচে আছে। তবু—'

'ওগো মা গো, তুমি সুদ্ধু পিচেশের মতন কতা কইছ কেন? প্রাণেই বেঁচেছে, পা দু'খানা যে জন্মের মত শেষ গেছে বললে?'

শশী ক্রুদ্ধ গলায় বলে, গেছে তো! বলেছি তো! বড়মানুষের গাড়ির চাকা গরীবের বুকের ওপর দিয়ে চলে যাবে। এই তো বিধাতা পুরুষের বিধান। তোর লাবির বুকের ওপর দিয়ে যে চলে যায়নি এই ঢের।'

'এই ঢের! আমার লাবির বে' হবে? লাবি পাঁচজনের একজন হবে?'

'দোহাই লাবির মা, থাম তুই। মেয়ে আগে বাঁচুক। তারপর অন্য কথা। আইন যদি থাকে, ধর্ম যদি থাকে, তো তাহলে ওই বড় মানুষের জামাই সুড় সুড় করে তোর মেয়ের উড়ে যাওয়া পায়ের দাম ধরে দিতে বাধ্য হবে।'

শশীর বৌ চোখ মুছে বলে, 'আইনে বলে একথা?'

'বলে' শশী বলে, 'তবে করে কিনা, জানি না।'

ঠিক এই সময় বাইরে শব্দ শোনা গেল, 'বাড়িতে কে আছেন?'

এত ভোরে, সাতটা বাজেনি এখনো, এখন কে আসতে পারে? চমকে ওঠে শশী, ভয়ে তার হাত-পা কাঁপে। শশীর গলা শুকিয়ে যায়।

তবু তাড়াতাড়ি দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু কার সামনে এসে দাঁড়ায়?

শশীর দোকানের সামনে অনেক কেষ্ট-বিষ্টু ব্যক্তিকেই এসে দাঁড়াতে হয়, শশীর ঢিলেমির জন্য বরাবরই দাঁড়াতে হয়। কিন্তু শশীর এই ইঁটের দেয়াল টিনের চালা বাসার দরজায় এমন রাজ-আগন্তুক এসে দাঁড়িয়েছে কবে!

শশী হতভম্ব হয়ে বাপ-মেয়ের মুখের দিকে তাকায়। হ্যাঁ, চেনে এঁদের শশী। কলের মুখ বদলাতে, সিস্টার্ণ সারাতে, জলের পাইপ বুজে গেলে ঠুকতে, সব ফ্ল্যাটেই যাতায়াত শশীর। আর ওই মেয়েকে? নিত্যিই তো বরের পিঠে চড়ে শশীর দোকানের সামনে দিয়ে যেতে আসতে দেখে। এই গতকালই তো দেখেছে।

তবে সেই রাক্ষস গাড়িখানা যখন শশীর পাঁজরার হাড়খানাকে পিষে দিয়ে চলে গেল, তখন এই মেয়ে সে গাড়িতে ছিল না।

শশীর মনের মধ্যে অনেক ওঠাপড়া। অতঃপর শশী সে সব চেপে ফেলে বলে 'আপনারা! এখানে!'

রঞ্জিত মিত্তির গম্ভীর হাস্যে বলেন. 'কারে পড়লে ব্যাঙের গর্তেও যেতে হয় শশী।'

সঙ্গে সঙ্গেই শশীর মুখ কাঠ হয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক। শশী কাঠগলাতেও বলে, 'তাই দেখছি।'

রঞ্জিত মিত্তির কিছু বলবার আগেই রীতা বাপের পিছন থেকে এগিয়ে এসে ব্যগ্র গলায় বলে, 'তোমার মেয়ের খবর কি শশী?'

শশীকে বাড়িতেই পেয়ে আর ঘুম থেকে উঠে আসতে দেখে রীতার প্রাণের ভিতর একটু আশার সঞ্চার হয়। তাই সাহস করে এগিয়ে এলো। নইলে আগে তো বাবার পিছনেই দাঁড়িয়েছিল ভয়ে ভয়ে। অথচ এই সাত সকালে দীপক ম্যানসনের কেয়ার-টেকারের কাছে শশীর ঠিকানা নিয়ে খুঁজে খুঁজে চলে আসাটা রীতারই চেষ্টার ফল।

রীতাই ঠিকানা আবিষ্কারের ওই পথ বাতলেছিল।

শশী রীতার এই আগ্রহ- ব্যাকুলতাকে ধর্তব্য করল না, তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, 'আপনারা যেমন রেখেছেন।'

রীতা নিভে গেল, চুপ করে গেল। অতঃপর সে আবার বাবার পিছনে সরে এল, না বাবাই তার সামনে এগিয়ে গেল কে জানে, এখন রঞ্জিত মিত্তির কথা বললেন। শক্ত মানুষ, ব্যাকুলতাহীন গলায় বললেন, 'দোষ করা হয়ে গেছে, সেইটা স্বীকার করতেই তো ব্যাঙের গর্তে আসা শশী। হাতি হাবড়ে পড়লে, ব্যাঙে যা করে সেটা আর নাই করতে এলে। ভবিষ্যতে ফের রুজিরোজগার করতে হবে তো? হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়লেই পেনালটি দিতে হয় জানা কথা, তোমার মেয়ের ঠিক অবস্থাটা না জানলে তো বোঝা যাবে না পেনালটিটা কত দিতে হবে।'

শশীর ইচ্ছে হয় বলে ওঠে, ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ করতে এসেছেন? করতে পারবেন না। আমি আপনার ওই সাধের জামাইটাকে

ঘানি টানিয়ে ছাড়ব। কিন্তু যা বলে ওঠার ইচ্ছে হয়, তা কি আর হিতাহিত জ্ঞান এবং সংসারজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ বলে উঠতে পারে?

শশীর মধ্যে মুহূর্তে অনেক ভাবের খেলা খেলে যায়।

'মুখ বন্ধ' করবার তালাচাবি যাদের হাতে আছে, তারা এখানে না পারলে অন্যত্র বন্ধ করতে যাবে। আর. কে. মিত্তিরের জামাই বি. কে. ঘোষকে ঘানি টানাবার সাধ্য কি শশী মিস্ত্রীর হবে? বরং এখন নরম হয়ে এসেছে, হাত কচলে কিছু বেশী আদায় করতে পারা যায়। নরমই বা কোথায়? মুখে মুখে চোটপাট করলে যে শশীর ভবিষ্যতের রুজি-রোজগারে টান পড়বে, সে ইঙ্গিতও তো পাওয়া গেল। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদের চির পুরনো প্রবাদটাই মনে পড়ল শশীর।

শশী তাই এখন উদার ভাব দেখিয়ে বলল. 'প্রাণে বেঁচে আছে এই পর্যন্ত, দুটো পা-ই এমন থেঁতলে গেছে, বোধহয় কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।'

রঞ্জিত মিত্তির সহৃদয় গলা বার করেন, 'না না, শশী, তা হবে না। আজকাল অনেক ভাল ভাল চিকিৎসা ব্যবস্থা হয়েছে, মরাকে বাঁচানো ছাড়া আর সবই করছে ডাক্তাররা। তবে টাকা তো লাগবেই, তা সেটাই আমি দেব। এখন তুমি নিজের হাতে কিছু রাখো, তারপর ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করো। বলবে, খরচের জন্যে চিন্তা নেই. যত রকম ভাল চিকিৎসা আছে তা যেন করা হয়।'

শশী বিহ্বল হয়।

শশী অনুভব করে, এঁদের যত হৃদয়হীন ভেবেছিল শশী, তত দেখছি নয়। অনুতাপ হয়েছে। হৃদয় আছে। শশীর চোখে জল এসে যায়, শশী তাই কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে বলে, 'জগতের খবর আপনারাই ভাল জানেন স্যার, যা বলবেন হবে।'

রঞ্জিত বললেন, কোন হাসপাতালে, 'কোন বেড আমায় জানিয়ে রাখো. একবার দেখে আসব মনে করছি—'

মনে অবশ্য আগে করেননি. ধরে রেখে ছিলেন গাদার মড়ার গুণতি বাড়িয়ে চলে গেছে। এখন যখন জানলেন প্রাণে মরেনি,

তিনিই বা প্রাণে মরতে যাবেন কেন ? শশীর মেয়েটার উপর একটু কৃতজ্ঞতাই এল। অবিশ্যি তা না হলেও যেতেন একবার—সরেজমিনে তদন্ত করতে।

শশী বলল, 'বাঙড়ে নিয়ে গেছে স্যার, নম্বর লেখা আছে, এনে দিচ্ছি—'

মিত্তির জিজ্ঞেস করলেন, 'নিয়েটা গেল কে ?' শশী কাতর বচনে যা বলল, তার সংক্ষিপ্তসার এই, রাস্তার এক ভদ্রলোক, শশী চেনে না, তিনিই তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি ডেকে—শশীকেও সেই ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে, ইত্যাদি। এও জানিয়ে দিল, মা-টা আছড়ে মরে শেষে রিক্সা করে মেয়ে দেখে এসেছে। তা তাকে থাকতে দেয়নি। রোজ যদি মেয়ে দেখতে রিক্সা চাপতে হয় যেতে আসতে দিন তিন টাকা। শশীর পক্ষে জোগানো সম্ভব ? তা অবুঝ মেয়ে মানুষ নিশ্চয় বুঝবে না। মেয়ে অন্ত প্রাণ। একটা মাত্তর সন্তান তো!

একটা মাত্তর সন্তান !

রীতার প্রাণ কেঁপে ওঠে। রীতা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'আচ্ছা রিক্সা-ভাড়ার জন্য—' রীতা হাতের ব্যাগের মুখের চেন টানে।

রঞ্জিত মিত্তির মৃদু গম্ভীরে বলেন, 'ব্যস্ত হচ্ছ কেন রীতা ? আমি তো তৈরী হয়েই এসেছি।'

রীতাও ততোধিক মৃদুতে বলে, 'তা হোক বাবু, সামান্য কিছু আমিও দিই—সবই তো ওর দেবার কথা, তুমিই ইচ্ছে করে নিজের ঘাড়ে নিচ্ছ—।'

রঞ্জিত একটু হেসে বলেন, 'যার ঘাড়টা বেশী শক্ত, তার দায়িত্বও বেশী রীতা !' যাক, তোমার ইচ্ছে হয়েছে দাও—।'

রীতা পার্স খুলে দুশো টাকা বার করে। বড় নোটে এবং ছোট নোটে মিলিয়ে। শশীর হাতে দিয়ে বলে, 'তোমার স্ত্রীর কাছে দিয়ে রাখো। রিক্সা টিক্সা—।'

শশী হাত বাড়িয়ে নেয়, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্যে পড়ে কর্তাও প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢোকাচ্ছেন। শশী না-দেখার ভান করে তাড়াতাড়ি বলে, 'আচ্ছা নম্বর টম্বরগুলো এনে দিচ্ছি—'

চলে যায়। একাসনে দুবার হাত পাততে লজ্জা করে বোধহয়।

ও চলে গেলে রঞ্জিত বলেন, 'যাক মেয়েটা আমায় বাঁচিয়েছে।'

'কিন্তু বাবু দুটো পা-ই যদি কাটা যায়?'

রঞ্জিত অনায়াসে বলেন, 'চুলোয় যাক। প্রতিক্ষণ কত হাত-পা কাটা যাচ্ছে তার হিসেব রাখতে পারবে তুমি? নিজেদের মাথাটা কাটা না গেলেই হল!'

রীতা বাবার মুখের দিকে তাকাল।

রীতার হঠাৎ একটা তুলনামূলক সমালোচনা মনে এলো। তারপর মনে এলো রীতার—জানোয়ার আর পিশাচ এই দুইয়ের মধ্যে মান নির্ণয় করা সম্ভব কি না।

শশী এসে এক টুকরো কাগজ দিল।

রঞ্জিত মিত্তির সেটা না দেখেই পকেটে পুরে আগের পকেট থেকে বার করা হাজার টাকাটা এগিয়ে ধরে বললেন, আপাততঃ এটা রাখো, পরে যেমন যা হয়—'

এনেছিলেন ওর পাঁচগুণ, কিন্তু পুরো প্রাণটার জন্যে যতটা দাম দেওয়া যায়, শুধু দুখানা পায়ের জন্যে তো আর ততটা দেওয়া যায় না! তাছাড়া শনৈঃ-পন্হা-বারে বারে দিতে হবে। তাতে কৃতজ্ঞতার হোমানল জীইয়ে রাখা হবে।

শশী কি করবে ভেবে না পেয়েই বোধহয় নোটের গোছাটা একবার কপালে ঠেকিয়ে, বিনয় বচনে বলে, 'আশীর্বাদ করুন যেন দুটো পা-ই না যায়, একটা তবু কম জখম হয়েছে—'

রীতা আস্তে বলে, 'দুটোই ভাল হয়ে যাবে। শুনলে তো এখন ডাক্তারীর কত উন্নতি হয়েছে—'

এই মিথ্যে স্তোকবাক্যের মধ্যে অবশ্য কোন প্রাণের স্বাদ পাওয়া গেল না। যে শুনল নীরবেই থাকল, যে বলল তারও ভিতর থেকে কোন সাড়া এলো না।

আসে না।

তবু সামাজিক সংসারী মানুষ সর্বদাই এমন প্রাণহীন কথা বলে থাকে।

গাড়িতে উঠে রঞ্জিত মিত্তির কিছুক্ষণ গাড়ি চালিয়ে বললেন, 'তোরা তাহলে সকালেই চলে যাচ্ছিস?'

রীতা বলল, 'তাই তো কথা হল।'

'তা বটে,' পিতৃহৃদয়ের স্নেহ নিয়ে বললেন মিত্তির সাহেব, 'তবে কাল তো অনেক ঝামেলা গেছে, রাতে প্রায় কিছুই খাসনি—মায়ের কাছে খেয়ে টেয়ে—'

'না বাবা, না। তাছাড়া কমলকে তো অফিস যেতে হবে।'

'আরে, ও যে বলল আজ যাবে না।'

'যাবে না!'

রীতার মুখে ব্যঙ্গের একটি সূক্ষ্মরেখা ফুটে ওঠে, 'কেন! অনুতাপ দিবস পালন করতে?'

বাবা হেসে উঠে বলেন, 'তুই ওকে বড্ড ইয়ে করিস রীতা। মানে অবজ্ঞা অছেদ্দা—'

রীতা চুপ করে থাকে।

তারপর রীতা আস্তে বলে, 'এ ব্যাপারে আমার দুঃখের দিকটা কোনদিন ভেবে দেখেছ বাবু?'

বাবু হেসে উঠে বলেন, 'ভাবলে তো বিপদ রে! সব ঠাকুরেরই যে কাদায় পা।' হ্যাঁ, এমন ভাবব্যঞ্জক গভীর অর্থবহ আত্মধিক্কারসম্বলিত কথা অনেক জানেন মিত্তির সাহেব এবং লাগসই ভাবে বলেনও। রীতার একটা নিশ্বাস পড়ল।

বাপ ভাই স্বামী, বয়েস হলে পুত্র, এই নিয়েই তো মেয়েদের প্রতিষ্ঠা। সেখানে যদি শ্রদ্ধার প্রশ্ন না থাকে, কী দুঃখ! কী দুঃখ! দাদাকে অবশ্য রীতা অন্য চোখে দেখে। কিন্তু দাদার সম্পর্কে সেই সশ্রদ্ধ মনোভাবের পিছনে—ঘাপটি মেরে আছে একটু ঈর্ষা। দাদা তো কেবল মাত্র রীতা-নীতার দাদাই নয়, সে যে ওই স্বাতী নামক মহিলাটির স্বামীও। সেখানে পূর্ণ আনন্দের স্বাদ কোথায়?

এক সময় মিত্তির আবার হেসে উঠে বললেন, 'শশীর তো মেয়ের একটা পা হলেও চলে মনে হল, তুই তো দুটোর জন্যেই ঢালাও আশীর্বাদ করে দিলি।'

রীতা বাপের মুখের দিকে ঘাড় তুলে তাকায়, ক্ষুব্ধ তিক্ত

জ্বালাভরা একটা গলায় বলে ওঠে, 'গরীবকে নিয়ে ঠাট্টা করার কোন বাহাদুরী নেই বাবু, মড়ার গায়ে গুলি ছোঁড়ার মতই সেটা। তোমারও ছেলেমেয়ে আছে, এবং যে-কোন মুহূর্তে তাদের যে-কোন রকম অ্যাকসিডেণ্ট হতে পারে—'

রঞ্জিত মিত্তির গাড়িখানাকে প্রায় দীপক ম্যানসনের গেটের কাছে এনে ফেলেছেন, এখন মেয়ের পিঠটা বাঁহাতে একটু ঠুকে দিয়ে বললেন, 'নাঃ, তুইও দেখছি তোর মায়ের মত সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে যাচ্ছিস। আগে তো এমন ছিলি না।'

রীতা কিছু বলার আগেই গাড়ি গেটের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

শশীর বৌ বলল, 'কই বললেনা—কত টাকা ?'

শশী বলল, 'রোসো বাবু, আর একবার গুণে দেখি—মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে।'

আবার গুণে দেখাটা ছল, বৌয়ের কাছে পুরো অংকটা জানাতে চাইছে না শশী। বড়লোকের মর্জি, টাটকা-টাটকি অনুতাপের বশে দিয়েছে বলেই যে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি রাখবে, কে সে গ্যারাণ্টি দিতে পারে ? বৌ হয়তো এক্ষুনি হৈ হৈ করে খরচা করতে চাইবে। নয়তো বান্ধবীদের বলে বেড়াবে। এই বারোঘর এক উঠোনের বাড়িতে বান্ধবীর অভাব নেই শশীর বৌয়ের। তাদের বরেদের সঙ্গে শশীরও বন্ধুত্ব।

তারা গতকাল অনেকে মিলে জটলা করেছে, এবং ওই বড়লোকের জামাইয়ের নামে কেস ঠুকে আসতে বলেছে নির্বেদ সহকারে। শশী মেয়েকে হাসপাতালে রেখে আসার পর হাপসে এসে পড়ে বলেছিল, 'আমার মাথার ঠিক নেই ভাই, তোমরাই করে দিয়ে এলে পারতে—'

এ প্রস্তাবে আগের প্রস্তাবটা জুড়িয়ে গেছে।

কিন্তু শশীর মনে একটা সন্দেহ আছে, পথচলতি যে ভদ্রলোক ট্যাক্সি ডেকে আহতকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে জমা দিলেন, তিনিই কি সব লেখালেখি করে এসেছেন হাসপাতালে ? নিজের

নাম-ঠিকানাও দিয়ে এসেছেন? শশীর জ্ঞানবুদ্ধি মতে ধারণা এই—ওই থেকেই পুলিসের কানে যাবে।

হাসপাতালে রুগী দেওয়াই সোজা নাকি? কত খোসামোদ, কত দৈ-দপ্তর, কথা কানেই নিতে চায় না কেউ। এখুনি মারা যেতে পারে বলে ভয় দেখিয়ে তবে ভদ্রলোক—

'কই, কথা বলছ না?'

বলল শশীর বৌ।

শশীকে অগত্যাই কিছু বলতে হল। গোঁজামিল করে বলল, 'ওই তো বললাম, মেয়ে দিয়ে গেল রিক্সা-ভাড়া বলে এই দুশো, আর বাদ বাকিটা—সব মিলিয়ে হাজার হলো আর কি।

শশীর বৌ মেজাজি গলায় বলল, 'তা কেবলই মুঠোয় চাপছ কেন? দেখতে দাও না একবার, হাতে নিয়ে দেখি।'

'এই তো দ্যাখ না। টাকা বৈ তো ঠাকুর-দেবতা নয় যে, দর্শনে পুণ্যি।'

শশীর বৌ ঝাঁজের গলায় বলে, 'ঠাকুর-দেবতার বাড়া। দর্শনে পুণ্যি তো বটেই। এতখানি বয়েসে, অতগুলো টাকা হাতে করে দেখেছি কখনো?'

'তবে দ্যাখ্!'

বলে শশী কৌশলে হাতের কায়দায় দুশো টাকা কোলের মধ্যে ফেলে বলে 'এই ধর। হাতে ছুঁয়ে সগ্গে যা। তোর স্বামী তো তোকে একসঙ্গে অত টাকা দেখাতে পারেনি, সন্তান দেখাল।'

শশীর বৌ ছিটকিটিয়ে উঠে নোটের গোছা ছুঁড়ে বরের কোলে ফেলে দিয়ে হঠাৎ কাঁদতে বসে, 'ওরে মা রে! আমার সোনার জাদু, যে রাক্কোস তোকে শেষ করে দেছে, তার যেন সর্বনাশ হয়, তার যেন আমার মতন বুক পোড়ে। ও মাগো, টাকা দে আমায় ভোলাতে এয়েছে, মায়ের প্রাণ টাকায় বুঝবে?

—ও মানিক আমার, তোর অর্থপিচেশ বাপকে একবার দেখে যা! টাকা পেয়ে তোকে—'

'তুই থামবি?'

শশী কড়া চাপা গলায় বলে, 'টাকার নাম উচ্চারণ করবি তো

টেনে কালিঘাটের গঙ্গায় ফেলে দে আসব। চুপ কর, লাবিকে দেখতে যাবি, বরং জেনে আসিস তার কিছু ইচ্ছে করে কি না। কিনে দিবি পরে।'

শশীর বৌ বলে, 'কাকে জিগ্যেসা করব? মেয়ের হুঁশ পর্ব আছে?'

'আছে ফিরবে হুঁশ।'

বলে শশী প্রসঙ্গে ছেদ টানে।

শশী চায় না বৌ এক্ষুণি টাকার কথাটা পাড়া-জানাজানি করুক। শশী তার বৌয়ের মত ভাবপ্রবণ নয়।

শশীর বৌ চোখ মুছতে মুছতে বলে, 'তার ইচ্ছে মেটাবার কথা তুলছ?'

বলেই আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে শশীর বৌ, 'কি কিনে দেব তাকে? সে যে বড় আহ্লাদ করে বলে রেখেছিল এবার পুজোয় ফেলাটের মেয়েদের মতন সাদা মোজা আর বাহারী জুতো নেবে—'

শশী গুম্ হয়ে বসে থাকে।

শশীর মেয়ের সেই বড় আহ্লাদের ইচ্ছে আর ইহজীবনে পূরণ হবে না।

শশীর মেয়েটা মারা যায়নি শুনে যেমন দীপক ম্যানসনের অনেকেই তবু খানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, তেমনি অনেকেই হতাশ হল মেয়েটা মরেনি শুনে।

মরলে অকুস্থলেই চিড়ে চ্যাপটা হয়ে গেলে ওই বিভাসকমলের কী ধরনের শাস্তি হত, সেটা তো দেখার বিষয় ছিল।…শোনা যাচ্ছে পা দুটো জখম হয়েছে, তাতে আর কত শাস্তিই হবে? বড়জোর ক্ষতিপূরণ। তাও পরিবারের একটা উপার্জনশীল লোক নয় যে, সেই অনুপাতে ক্ষতিপূরণ ধার্য হবে।…বড়জোর একটা পোষা কুকুর চাপা দেওয়ার মত।

এই দীপক ম্যানসনেরই কাপুর সাহেব তাঁর পোষা কুকুর মিণ্টোকে চাপা দিয়ে জখম করার অপরাধে, পাড়ার প্রতিবেশী গগন চ্যাটার্জির কাছ থেকে হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ আদায়

করেছিল। বলেছিল ইন্‌ভ্যালিড্‌ কুকুর নিয়ে সে কী করবে? তাকে তো আবার একজনকে আনতে হবে মিণ্টোর জায়গায়।...

মানুষ অবশ্য বলতে পারে না যে তার ইন্‌ভ্যালিড্‌ আপনজনকে নিয়ে আর কী করবে? তাই ক্ষতিপূরণের হার কিভাবে নির্দিষ্ট হবে বলা শক্ত। শুধু টাকার অঙ্ক ক্ষতিপূরণে এমন আর কি ক্ষতি? সবটাই যে বিভাসকমলের লাগবে, তাও তো নয়। বিভাসকমলের নৌকো বড় গাছে বাঁধা আছে।

তা কথাটা মিথ্যা নয়, বড় গাছেই বাঁধা বটে। তাই ইন্‌ভ্যালিড্‌ মোটরবাইকটাকে সেই বড় গাছের হাতে সমর্পণ করে বৌ মেয়ে নিয়ে নিজের বাড়ি ফিরে গেল বিভাসকমল শাশুড়ীর কাছে জামাই আদর আর শালাজের কাছে চা খেয়ে।

রঞ্জিত মিত্তির তাঁর জামাইটাকে তেমন গণ্য করেন না বলেই, সুলেখাকে বেশী গণ্য করতে হয়। তাঁর মতে, মেয়েতো আর ভাব করে বিয়ে করতে যায়নি, নিজেরাই দেখে-শুনে দেওয়া হয়েছে, অতঃপর সে যদি তোমার ধারণা অনুযায়ী উন্নতি না করে, তোমার মেয়ের ভাগ্য।...নইলে এখনো একখানা গাড়ি করতে পারল না জামাই! মোটরবাইক চেপে ঘুরে বেড়ায়। অথচ ওই একই পড়া পড়েছে সঞ্জিত, সঞ্জিতেরই সহপাঠী বিভাস, সঞ্জিত কতখানি উঁচুতে উঠে গেছে। এঞ্জিনীয়ারের উন্নতি তার কাজের উপর, সরকারি সিঁড়ি ভাঙা নিয়মে নয়।...

যাক, জামাই যখন বৌ-মেয়ে নিয়ে শ্বশুরের গাড়িতে উঠে দীপক ম্যানসনের গেট থেকে বেরিয়ে গেল, তখন ম্যানসনের অনেক জানলাতেই মুখ। মানে চোখ। স্বভাবতঃই তাদের মনে হয়, একেই বলে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

নিজের বাড়িতে এসে বিভাসকমল নিজমূর্তি ধরল। শ্বশুরবাড়িতে তার সমাদর আছে যথেষ্ট, এবং সানুনয় আমন্ত্রণও পায় সর্বদা। তবু গেলেই কেমন একটা সূক্ষ্ম অপমানবোধ তাকে ভিতরে ভিতরে ছুঁচ ফোটায়! কেন, তা জানে না। অথচ ওই সূক্ষ্ম জ্বালাটাই সারা মনে একটা তিক্ত অনুভূতির সৃষ্টি করে।

তাই প্রতিবারই শ্বশুরবাড়ি ঘুরে এসে বাড়ি ফেরে বিভাস

মেজাজ খাপ্পা নিয়ে। এসেই হয়তো অকারণে অজিতকে ধমকায়, মৌকে বকে, এবং রীতার সঙ্গে ঠান্ডা লড়াইতে নামে।

এমনিতেই এই, আজ তো কথাই নেই। তাছাড়া শশীমিস্ত্রীর মেয়েটা বেঁচে আছে শুনে পর্যন্তই ওর নিজের দোষের ভার হালকা হয়ে গিয়ে গতকাল থেকে যা যা লাঞ্ছনা অপমান ঘটেছে, সব কিছু দুরন্ত অন্যায় বলে মনে হচ্ছে।···উঃ, কালকের সেই জঘন্য গালাগালি! সে তো ওই শ্বশুরবাড়িরই পাড়ার অবদান।··· তারপর স্বয়ং শ্বশুরের? উপেক্ষা নির্লিপ্ততা আর তীক্ষ্ম কঠোর হুল।

অতএব রীতা যখন বাড়ি ঢুকেই প্রশ্ন করল, 'সত্যিই অফিস যাবে না নাকি?' তখন এই সামান্য কথাতেই ফেটে পড়ল।

রীতা তাকিয়ে দেখল মৌ বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সোজা অজিতের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে। গতকাল থেকে বিরহ বেদনা, তার উপর আবার গতকালকের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ভার।···এটা উজাড় না করা পর্যন্ত তো মৌ জামা-জুতোও খুলতে রাজী হবে না।

রীতা এখন হাতের ব্যাগ নামিয়ে স্বস্থানে রাখতে রাখতে নিরুত্তাপ গলায় বলে, 'কী আশ্চর্য কমল, তুমি অকারণ এমন রেগে যাচ্ছ কেন?'

'অকারণ!'

বিভাসকমল সামনের সেণ্টার টেবিলটার উপরই একটা ঘুসি মেরে বলে, 'অকারণ? জানো—কাল থেকে আমার নার্ভের উপর যা চাপ পড়ছে, তাতে অন্য যে কারুর হার্ট অ্যাটাক্ করে যেতে পারত।

রীতা আর একটা সোফায় বসে পড়ে।

গদিটা লাফিয়ে উঠে স্থির হয়। এসব রীতার বিয়ের সময় বাপের কাছ থেকে পাওয়া। রীতিমত দামী জিনিস।

রীতা অনেক সময় হেসে হেসে বলে, 'শ্বশুরের কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছ তুমি কমল, সবই দামী।'

এখন রীতা বসে পড়েই বলে, 'টেবিলটা কাঁচের কমল।'

বিভাসকমল সে কথায় লক্ষ্য না দিয়ে ব্যঙ্গের গলায় বলে, 'সকাল বেলা পিতা পুত্রীতে গিয়ে কী করে আসা হল? শশী-মিস্ত্রীর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে আসা হল?'

রীতা চোখ বড় করে বলে, 'শুধু এই? শুকনো ক্ষমা চাওয়ার আবার মূল্য আছে নাকি?'

'তাহলে বোধহয় ঘুস দিতে যাওয়া হয়েছিল?'

'যাক বুঝেছ তা'হলে? বোঝ তুমি সবই কমল, তবে বড্ড দেরীতে, এই যা।'

তাই, এই ভঙ্গী রীতার, ঠিক বাপের মত।

অসহ্য!

বিভাস চড়া গলায় বলে, 'কত খশিয়ে এলে?'

রীতা পা দোলাতে দোলাতে বলে, 'আমি? আমি যৎসামান্যই। বাকিটা তোমার বড়লোক শ্বশুর দিলেন। এবং ভবিষ্যতে আরো দেবার প্রমিস করে এলেন।'

'বাঃ!'

বিভাসকমল মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'তা সবসুদ্ধ কত দাম ধার্য হল ওই মিস্তিরির মেয়ের?'

'সে আর এখন কি করে বলা যায়? ওর সব রকম চিকিৎসার দায়িত্ব তো নিতে হবে।'

'ও! তা মিস্তিরি যদি দাবি করে বসে, এদেশে তার দামী মেয়ের ট্রিটমেণ্ট হবে না, ওদেশে পাঠাতে হবে?'

রীতা সমান সহজ গলায় বলে, 'তা তেমন দাবি করবার সাহস যদি হয় শশীর, আর আইন সে দাবি সমর্থন করে, তাহলে তাও করতে হতে পারে।'

'ও, আইন।'

বিভাসকমল তেতো গলায় বলে, 'দেশে আইন বলে কিছু থাকলে কালকের ওই সন্তানগুলো এখনো জেল হাজতের বাইরে থাকত না।'

রীতা এখন একটু গম্ভীর হয়। গম্ভীর হাসি হেসেই বলে, 'আইনটা তোমার হাতে না থাকলে, অবশ্যই থাকত না বাইরে।

কিন্তু তোমার কি মনে হচ্ছে তোমার এরকম কিছুই প্রাপ্য ছিল না।'

'এরকম!'

বিভাসকমল উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'সত্যি খুন করলেও বোধহয় এরকম –'

রীতা বলে, 'আসলে কি তুমি সত্যি খুন করোনি?'

বিভাস কড়া গলায় বলে, 'তার মানে?'

'মানে বোঝাবার কি খুব দরকার আছে?' রীতা বলে, 'শশীর মেয়েটা বোকার মত আধখানা হয়ে বেঁচে রইল বলেই কি তোমার খুনটা মাপ হয়ে গেল কমল?'

বিভাসকমল আবার ভুলে যায়, সেণ্টার পীস্‌টায় কাঁচের টপ্‌, আবার জোরে একটা ঘুসি বসিয়ে বলে, 'তোমার ঘটনাটা কি বল তো? কী বলতে চাও তুমি?'

'বলতে আর নতুন কি চাইব?' রীতা বলে, 'কাউকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যাওয়াকে আমি খুন ছাড়া আর কিছু বলি না।'

'চমৎকার! ওইখানে নেমে পড়ে মানবিকতা দেখাতে গেলে, দেখাবার সুযোগ পেতাম? তোমার বাপের বাড়ির পাড়ার ছেলেরা –'

'সব পাড়ার ছেলেই সমান।'

'কক্ষনো নয়। ওদের যদি হাতে পেতাম চাবকে চামড়া ছাড়িয়ে নিতাম—'

রীতা হেসে উঠে বলে, 'উঃ ভাগ্যিস পাওনি হাতে। ওই বীরত্বের ভয়ে তো মা বন্দুক নিয়ে একঝুড়ি মিছে কথাই বলে মরল। কস্মিনকালেও বাবুর কাছে কোন চাবি থাকে না।'

'ওঃ।' বিভাসকমল বলে, 'তাহলে কাল সপরিবারে বেশ একখানা নাটক অভিনয় হল?'

'উপায় কি? জামাই ফাঁসিতে লটকাবে, মেয়ে বিধবা হবে, এ আর কে চায় বলো?'

বিভাস আর কি বলতে যাচ্ছিল চুল দুলিয়ে ফ্রক উড়িয়ে মৌ ছুটে এল, 'বাপী জানো? অজিতদা বলেছে, সেই কালকের

ডাকাতগুলোকে না, মেরে একদম শেষ করে দেবে। কেটে কুচি কুচি করে রান্না করে খাবে।'

রীতা বলল, 'ডাকাতের কথা অজিত কি করে জানল? তুমি বুঝি এসেই ওই গল্প জুড়েছ?'

মৌ জোর গলায় বলে, 'আমি তো বলতেই যাচ্ছিলাম. অজিত বলল. জানি জানি, তোর মামার বাড়ির ওপরতলায় সাহেবের কুকুর আমায় ফোন করে বলেছে সব।'

'চমৎকার!' রীতা বলে, 'বুঝেছি—টুম্পাদের সার্ভেণ্ট নবীন যে অজিতের দেশের লোক।'

একটু ফিরে দাঁড়ায়, বরের দিকে তাকিয়ে বলে, 'অতএব অজিতের কাছেও তোমার দুর্দশার কিছু ঢাকা থাকল না। তার মানে এই পাড়ার কারো কাছেই না।'

বিভাসকমল আবার বসে পড়ে বলে, 'মনে হচ্ছে ব্যাপারটাকে তুমি খুব এনজয় করছ।'

রীতা গম্ভীর হয়ে যায়, গম্ভীর গলায় বলে. 'এনজয় করছি, একথা তুমি বলেই বলতে পারলে, আমি শুধু তোমায় বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম, বলছিলাম নিজেকে কতখানি প্রচার করবার ক্ষমতা রাখে? যাক, অফিস যখন যাচ্ছই না, তখন বিশ্রাম করো, আমি দেখিগে অজিত কাল থেকে কি কি অকর্ম করে রেখেছে। এই ভেবে দুঃখ হচ্ছে অজিত তোমার দিকে ব্যঙ্গদৃষ্টিতে তাকাবে।'

'অজিত!'

বিভাসকমল উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আচ্ছা, এক্ষুনি তাড়াচ্ছি আমি ওকে—'

রীতা কঠিন গলায় বলে, 'থামো আর কেলেঙ্কারী বাড়িও না।'

রীতা বরকে বলে, 'কেলেঙ্কারী বাড়িও না' অথচ নিজেই বাড়ায়। বাড়িয়ে চলে।

বাড়ানোই বলব, না হলে রোজ রোজ তোর বাঙ্গুর হাসপাতালের মত অধম একটা জায়গায় গিয়ে একটা মিস্ত্রীর মেয়ের বিছানার ধারে বসে থাকবার কি দরকার? অথচ থাকবে তাই রীতা। রোজ যাবে, গিয়ে বসে থাকবে শশী মিস্ত্রির সঙ্গে।

অবিশ্যি বেশী দিন এখানে থাকতে হবে না, রীতার চেষ্টায় পি. জিতে ব্যবস্থা হয়েছে ওর, ক'দিন পরেই নিয়ে যাবে সেখানে, তারপর রাজকীয় চিৎকসা হবে।

রঞ্জিত মিত্রও অবশ্য মেয়ের এই 'ন্যাকামী'তে বিরক্ত। বলেছেন, 'যথেষ্ট টাকাকড়ি তো দেওয়া হয়েছে, আর কেন ?'

তা দেওয়া তো হয়েইছে যথেষ্ট।

নাহলে আর পুলিসী জেরার মুখে শশী স্বীকার করে মেয়েটা তার বড় ছটফটে ছিল, ছুটে ছুটে রাস্তায় গিয়ে পড়ত, কতদিন গাড়ির মুখ থেকে টেনে এনেছে শশী, চাপা পড়তে পড়তে রয়ে গেছে। দোষ ঘোষসাহেবের নয়, দোষ শশীর অদৃষ্টের।

এই স্বীকারোক্তির পরও আবার কর্তব্যের ফিতে লম্বা করবার কি আছে ?

কিন্তু পা থেকে গলা পর্যন্ত চাদর চাপা দেওয়া শুধু একখানা মুখ যেন রীতাকে টানতে থাকে।

রীতা গিয়ে ঢুকলেই সেই মুখটা আনন্দে আর কৃতজ্ঞতায় যেন বিহ্বল হয়ে ওঠে। রীতা দু'হাত ভরে জিনিস নিয়ে যায়, সেগুলো নামিয়ে রেখে পাশে রাখা টুলটায় বসে পড়ে বলে, 'তারপর আজ কেমন।'

লাবু কেন জানি না রীতাকে বলে মেম মাসিমা। প্রথম প্রথম কথা বলতে সাহস করত না, ক্রমে সাহস হয়ে গেছে, বলে, 'আচ্ছা মেম মাসিমা, আপনি রোজ আসেন, আপনাকে কেউ বকে না ?'

রীতা অবাক হয়ে ভাবে একথাটা মেয়েটা জেনে ফেলল কি করে ?

তবে অবাকটা দেখাল অন্য ভাবে। বলল, 'ওমা আমি এতবড় মেয়ে, আমায় আবার বকবে কে ? আর কেনই বা বকবে ?'

লাবু বলে, 'আমরা এত গরীব, তোমরা এত বড়লোক।'

মেয়েটা রীতাকে কখনো সমীহ করে বলে 'আপনি', কখনো ভালবাসায় বিগলিত হয়ে বলে, 'তুমি।'

রীতা বলে, 'বড়লোকদের বুঝি গরীবকে চোখে দেখতেও নেই?'

লাবু লজ্জা পেয়ে বলে, 'য্যাঃ তাই বলছি বুঝি ? বাবা বলে তোমার খুব দয়া।'

রীতা গম্ভীর হয়ে বলে, 'দয়া না ছাই। আমার বরই তো তোর পায়ের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছে। আমার লজ্জা নেই?'

লাবু ছেলেমানুষ, তবু লাবু বুড়োমানুষদের মত একটা কথা কয়। হয়তো চিরদিন শুনে আসা মুখস্থ কথাই কয়, বলে, 'আমার ভাগ্যে ছিল লাগা, ওঁর কি দোষ?'

লাবু এখনো জানে তার পায়ে খুব লেগেছে। জানে না তার দু' দুখানা পা-ই সে হারিয়েছে।

কিন্তু যেদিন লাবু নামের ওই অবোধ সরল শিশুটিকে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে? সেদিন কি লাবু এত সহজে ক্ষমা করতে পারবে তার মেম মাসিমা আর তাঁর বরকে?

মেম মাসিমার সঙ্গে লাবুর যে গল্প হয়, তাতে তার পা দুটোকে চিরতরে হারানোর আশংকার কথা থেকে না। ও অবলীলায় বলতে পারে, 'আচ্ছা মেম মাসিমা, পুজোর সময় আমার পা ঠিক হয়ে যাবে তো?'

রীতা অন্য দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, 'কি করে বলব বল, আমি কি ভগবান?'

'বাঃ, তুমি তো অনেক বিদ্বান, সব জানো। মা বলেছিল পুজোর সময় আমাকে সাদা মোজা, আর ঘুণ্টি দেওয়া জুতো কিনে দেবে।'

রীতা ছটফটিয়ে উঠে পড়ে বলে, 'আজ আমি যাই লাবু।'

পা হারিয়ে লাবুর ভাগ্য ফিরেছে বলতে হবে, তা নইলে শুধু মেম মাসিমা কেন, আরো একজন ঝকঝকে মানুষও তো আসে তার কাছে। সেই ভদ্রলোক যিনি লাবুকে রাস্তা থেকে তুলে এনে এখানে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি শশীকে আর তার বৌকে বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন, মেয়ের কাছে কান্নাকাটি করে যেন তার দুর্ভাগ্যের বার্তা এখুনি তার কানে না তোলে তারা। তবে যেদিন শুনেছেন ভদ্রলোক, শশী পুলিসের কাছে বলেছে, দোষ আর কারো নয়, তার ভাগ্যের,

আর দোষ তার মেয়ের—সেদিন থেকে ভদ্রলোক ঘৃণায় আর শশীর সঙ্গে কথা বলেন নি।

লাবুর সঙ্গে দেখা করে চলে যান।

বয়েস বেশী নয়, কিন্তু রাশভারী, কেউই সাহস করে কথা বলতে পারে না।

লাবুও না। তিনি যদি কিছু প্রশ্ন করেন, আস্তে উত্তর দেয় লাবু। তিনি টফি চকোলেট ইত্যাদি যা কিছু নিয়ে আসেন, কৃতার্থমন্যের হাসি হেসে নেয়। কিন্তু আজ সে কথা কইল নিজে থেকে। বলল, 'জানেন? আমি আর এই পচা বিচ্ছিরি হাসপাতালে থাকব না, চলে যাব। সুন্দর হাসপাতালে গিয়ে থাকব।'

ভদ্রলোক টুলে বসে থাকা রীতার দিকে এক পলক চোখ ফেলে উৎসাহ দেখিয়ে বলেন, 'তাই নাকি?'

ভদ্রলোক শশীর বৌয়ের মুখে রীতার পরিচয় শুনেছেন, মহিলাটি যে স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই এই ভাবে দিনের পর দিন এই পরিবেশে এসে বসে থাকেন, তা জানেন তিনি, এবং অনুমান করেন অলক্ষ্যেতে আরো কিছু করে চলেছেন, তা নইলে শশী-দম্পতি ওঁর প্রতি এত সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞ কেন। তবু ভদ্রলোক কোনদিন মহিলাটির সঙ্গে বাক্যালাপ করার চেষ্টা করেন নি!

কি দরকার!

বড়লোকের গিন্নী, কখন কি মুড্এ থাকবেন।

এই প্রায়শ্চিত্তের ঘটা অনুতাপ উদ্ভূত কি ভয় থেকে উদ্ভূত কে জানে। হয়তে স্বামীর জন্যে এখনো আশঙ্কা আছে। হয়তো ভয়—যারা ওঁর স্বামীর বাইকখানা ইঁটিয়ে ভেঙেছিল, তারা সুবিধে পেলে এখনো ইঁটের অন্য ভাবে সদ্ব্যবহার করতে আসবে কি না। মিস্ত্রী ক্লাসের লোকেদের জনবলটা থাকে।

যে কারণেই হোক ভদ্রলোক রীতা সম্পর্কে মোটেই উৎসাহী নন।

শুধু আজ যখন শুনলেন লাবুর ঠাঁই বদল হবে, তখন একবার তাকালেন, বুঝলেন, এই ব্যাপারের নায়িকা ইনিই। শশী নিজেই

যখন স্বীকার পেয়েছে, দোষ গাড়ি-চালকের নয়, তখন আর এঁর ভীতির কারণ বেশী ছিল না তাহলে হয়তো সত্যিই হৃদয়বতী।

ভদ্রলোকের উৎসাহব্যঞ্জক প্রশ্নে লাবুর মুখ আরও খোলে, বলে, 'হ্যাঁ, মেম মাসিমা বলেছেন, সেখানে সুন্দর খাট, সুন্দর ঘর, আমি একা একটা ঘরে থাকতে পাবো—'

'এই সেরেছে, তাতে তোমার ভয় করবে না?'

'বাঃ সেখানে মা এসে থাকতে পাবে তো!'

লাবুর চোখ উৎসাহে চকচক করে।

ভদ্রলোক বলেন, 'সবই তো বুঝলাম, কিন্তু 'মেম মাসিমা' মানে কি বুঝলাম না তো? তোমার স্কুলের মাসি?'

লাবু অবাক হয়ে বলে, 'এমা ইস্কুলে আবার মাসি কি? সে তো দিদিমণি। আমি তো মোটে এক দু মাস ইস্কুলে গেছি, কেউ চেনেই না। মেম মাসিমা তো এই আপনার সামনেই বসে।'

আর উপেক্ষা করা ভাল দেখায় না, ভদ্রলোক হাতজোড় করে নমস্কারের মত করে হেসে বলেন, 'মাপ করবেন, আপনার এই বিরাট পরিচয়টি আমার জানা হয়নি এতদিন। রোজ আসেন দেখি। কি সূত্রে এই পরিচয়টি অর্জন করেছেন?'

রীতাও এঁকে প্রায়ই দেখে, এঁর মহানুভবতা, অথবা নাগরিক কর্তব্যবোধ, যাই হোক, হৃদয়ঙ্গম করে এঁর প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করে, তবু সে-ও নিজে থেকে কথা বলতে যায়নি। আজ বলতে পেরে খুশী হল।

বলল, 'কি জানি আমার মধ্যে হঠাৎ কি আবিষ্কার করে বসেছে ও, তাই এমন অদ্ভুত নামকরণ করেছে।'

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বলেন, 'ওর মনোজগতে হয়তো সর্বোচ্চ আদর্শের প্রতিমূর্তি হচ্ছে 'মেম'। সে যাক, একে কি পি. জি-তে নেওয়াচ্ছেন?'

রীতা বলে, 'চেষ্টা তো করলাম অনেক, পাচ্ছি না তো। একটা প্রাইভেট নার্সিংহোমে ব্যবস্থা করে ফেলা হয়েছে, নতুন খুলেছে, ভাল ভাবে কেয়ার নেবে মনে হয়।'

'আপনি বেচারীর জন্যে অনেক করছেন।'

রীতা চোখ তুলে আস্তে বলে, 'কিছুই করছি না, শুধু সামান্যতম প্রায়শ্চিত্ত করবার চেষ্টা করছি। হয়তো আপনি সেখানে উপস্থিত না থাকলে মেয়েটা পথে পড়েই মারা যেত।'

ভদ্রলোক আস্তে ইংরেজিতে বলেন, 'অবশ্য তাছাড়াও বিশেষ কিছু হচ্ছে না। বাঁচানো তো গেল না।'

রীতার মুখে অদ্ভুত একটা ব্যঙ্গহাসি ফুটে ওঠে, 'আর একজনকে অবশ্য গেল।'

ভদ্রলোক একটু তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, 'তা বটে।'

রীতা হঠাৎ ব্যগ্র গলায় বলে ওঠে, 'আচ্ছা তেমন দুর্ঘটনা ঘটলে অপরাধীর কি শাস্তি হয় আপনি জানেন ? জেল না ফাঁসি ?'

ভদ্রলোক ওই ব্যাগ্র প্রশ্নের পিছনে উদ্বেগের ছাপ দেখতে না পেয়ে অবাক হন, তবু শান্ত ভাবে বলেন, 'আমার ঠিক জানা নেই, আইনের সূক্ষ্ম জালের মধ্যে কোথায় কি ফাঁক থাকে, যার মধ্য দিয়ে বুদ্ধিমানেরা গলে বেরিয়ে আসতে পারে। তবে সে রকম ক্ষেত্রে আমি অন্ততঃ কখনো কারো ফাঁসি হতে শুনিনি।'

'জেল ?'

'তা বোধহয় হয়।'

'ঠিক জানেন না ?'

'দেখুন ইহসংসারের অনেক ব্যাপারই আমরা ঠিক জানি না। যতক্ষণ না সেটা প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের ওপর এসে পড়ে, সঠিক জানা যায় না। কিন্তু কেন বলুন তো ? আর তো এখন সে প্রশ্ন নেই। কেস তো ওঠেনি। মিটিয়ে ফেলা হয়েছে তো।'

রীতা হঠাৎ তীক্ষ্ন গলায় বলে ওঠে, 'সেটাই তো আপসোস ! টাকার তুলি বুলিয়ে সব কালি মুছে মিটিয়ে ফেলতে পারা গেলে 'অপরাধ' শব্দটাই তো অর্থহীন হয়ে যায়।'

ভদ্রলোক খুব গভীর দৃষ্টিতে রীতার উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন। তারপর বলেন, 'কিন্তু মিটিয়ে নেবার চেষ্টাটা তো আপনার দ্বারাই হয়েছে, রঙের তুলিতো আপনার হাতেই ছিল—।

'না !'

রীতা উদাস গলায় বলে, 'ওটা আমার বাবার ব্যাপার। আমি শুধু এদের পরিবারকে—কীরে লাবু কি হয়েছে ?'

লাবুর চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে। লাবু যেন বালিশ থেকে ঘাড় তুলতে চেষ্টা করছে।

এ প্রশ্নে লাবু কেঁদে ফেলে বলে, 'তোমরা ইংরিজি করে কী বললে ? ফিসফিস করে কী বলছ ? কার ফাঁসি হবে ? কার জেল হবে ?'

'এই সেরেছে !' .

রীতা দিব্যি হেসে উঠে বলে, 'এতে তুই ভয় পাচ্ছিস কেন ? তোর জেল আর আমার ফাঁসি হবে নাকি ? এ অন্যদের কথা হচ্ছে। খবরের কাগজের কথা হচ্ছে।'

'ভালোবাবু' তোমার চেনা ?'

'চেনাই তো। রোজ দেখা হচ্ছে।'

লাবু একটু আশ্বস্ত হয়ে বলে, 'কী লিখেছে খবর কাগজে ?'

'আরে বাবা, সে ইংরিজি কাগজের ব্যাপার তোকে বোঝাতে বসলে অনেক দেরী হয়ে যাবে। যাচ্ছি, কেমন ?'

বলে ওর কপালে একটু হাত বুলিয়ে দিতে গিয়ে চমকে উঠে বলে, 'এ কী, তোর গা যে গরম !'

'তাই নাকি ?' ঝকঝকে ভদ্রলোকও একটু মলিন হয়ে যান, বলেন 'নার্সকে ডেকে বলতে হয় তো—'

'নার্স' !'

রীতা একটু ক্ষোভের নিশ্বাস ফেলে বলে, 'দেখুন যদি পান। এই জন্যেই অন্যত্র নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু যোগাড় করে ওঠা যে কত শক্ত। সর্বত্রই ভীড়। কিন্তু এতক্ষণ আলাপ হল আমরা কেউ কারুর নাম জানি না।'

ভদ্রলোক বলেন, 'আমি আপনার নাম জানি, 'মিসেস ঘোষ' ! আপনি আমারটা জানুন, নিখিল সেন।'

অতঃপর খুঁজে-পেতে একটি থার্মোমিটার হাতে নার্সকে ধরে আনেন নিখিল সেন, দেখা যায়, জ্বর নেহাত কম নয়।'

'হঠাৎ জ্বরটা হল কেন ?'

রীতার এই উদ্বিগ্ন প্রশ্নে মাঝবয়সী নার্সটি বিরক্ত গলায় বলেন, 'সেটা আপনারা ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করুনগে।'

চলে যান গটগটিয়ে।

সময় পার হয়ে গেছে, রীতাদের চলেই যেতে হয়, ডাক্তারকে ফোন করে বিফল হয়ে চলে গেল। পথে নেমে নিখিল সেনের সঙ্গে লাবুর কথাই হয়।

আশ্চর্য ইনটেলিজেণ্ট। ভাল ঘরে জন্মালে উচিতমত পড়াশোনার সুযোগ পেলে হয়তো কত উন্নতি করতে পারত। এই সব।

আর উন্নতি !

রীতা গভীর দুঃখের গলায় বলে, 'জীবনটাই তো বরবাদ হয়ে গেল।'

মাঝে মাঝে বিকেল বেলা মৌকে 'দীপক ম্যানসনে' রেখে দিয়ে লাবুকে দেখতে যায় রীতা। ফেরার সময় মার কাছে বসে চা খেয়ে মেয়েকে নিয়ে চলে যায়।

আজ তাই করেছিল। সুলেখা চায়ের টেবিলের সামনে বসে বলেন, জামাই তো সেই অবধি এ পাড়ায় আসা বন্ধ করেছেন, তুই বা কী ভেবেছিস ? রোজ ওই অখাদ্য হাসপাতালটায় গিয়ে বসে থাকা। নিজের মেয়েটাকে তাকিয়ে দেখিস না। ঢের তো করা হল তাদের, দুপাঁচ হাজার টাকা তো ঢালা হল তাদের পায়ে, আর কত প্রায়শ্চিত্ত চাই ?'

রীতা গভীর চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আরো হাজার হাজার টাকা তাদের পায়ে ঢাললেও তাদের মেয়ের পা দুটো ফিরবে না মা।'

সুলেখা মেয়ের এত ভাবপ্রবণতায় বেজার হল, যতই হোক একটা মিস্ত্রীর মেয়ে বৈ তো নয় ? সত্যি তো আর বিভাস ইচ্ছে করে তাকে চাপা দিতে যায়নি। অ্যাকসিডেণ্ট হচ্ছে অ্যাকসিডেণ্ট। মেয়ে আমার সেইটাকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করছে।

বেজার ভাব গোপন না করেই বলেন, 'সবই ভাগ্যে করে রীতা। মেয়েটা খেলতে খেলতেও পড়ে পা ভাঙতে পারত। এত ইয়ে করলে চলে না।'

নীতাও বলে, 'সত্যি দিদি, তুই যেন ঘর-সংসার সব ছেড়েই দিয়েছিস মনে হচ্ছে। তোর অজিতকুমার সেদিন বলল, তুই নাকি ওকে বকা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিস। খুব ডেঞ্জারাস অবস্থা, তা শশীর মেয়েটাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়বে কবে?'

'ছাড়বে?'

রীতা বলে, এখন ছাড়ার কথা কি।

'এখন তো ওকে 'গোল্ডন নার্সিংহোমে' নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এরপর অপারেশন করে দেখা হবে কতদূর কি রক্ষা করা যায়—'

সুলেখা অবাক হয়ে বলেন, 'তার মানে এখন আরো রাজসই খরচের ধাক্কা। এ সবই তোদের করতে হবে?'

রীতা হেসে বলে, 'তবে না তো কি শশীমিস্তিরী করবে?'

সুলেখা জ্বলে ওঠেন।

মেয়ের এই আদিখ্যেতা তাঁর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি মনে হয়, রেগে গিয়ে বলেন, 'তা মেয়ের জন্যে পেয়েছে তো অনেক টাকা।'

'মেয়ের জন্যে পায়নি মা, রীতা বলে, 'মেয়ের বদলে পেয়েছে। গরীবের সেইটুকু লাভ। না পেলে, শশী কি বলতে আসত দোষ তার মেয়ের আর তার ভাগ্যের?'

'জানি না মা! তুমিই জানো। তবে এ আমি বলবই, তিল থেকে তাল করছ তুমি। তোদের বাবুও তাই বলছিলেন—'

'বাবু?'

রীতা একটু হেসে বলে, 'জামাইয়ের শ্বশুর তো! আচ্ছা চলি —মৌ কই?'

সুলেখা এখন মেয়েকে আটকাতে চেষ্টা করেন, বলেন খেয়ে যেতে, এবং বাপ ফিরলে বাপের গাড়িতে যেতে। বললেন, ভাল রান্নাবান্না হয়েছে আজ, জামাইয়ের জন্যে দিয়ে দেবেন গাড়িতে, রীতা রাজী হল না। বলল, 'আজ মন ভাল নেই মা, আজ থাক।'

নীতা বলে ওঠে, 'নতুন কি কারণ ঘটল দিদি মনের অসুখের?'

'আরে মেয়েটার দেখলাম আজ হঠাৎ বেশ বেশী জ্বর এসেছে। জ্বর টর তেমন ভাল নয়। তাছাড়া ডাক্তারকেও তো পাওয়া যায়

না সহজে। এই গোল্ডেন নার্সিংহোমে এনে ফেলতে পারলে বাঁচা যায়। প্রাইভেট জায়গা, ডাক্তার সর্বদাই থাকবে—'

এখান থেকে আরও একবার হাসপাতালের ডাক্তারকে ফোন করার চেষ্টা করল, পেল না। চলে গেল শুধু চা খেয়ে।

সুলেখা নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'ওই শশীর মেয়েটাই আমার মেয়ের শনি হয়ে এলো। এই সূত্রে জামাইয়ের সঙ্গে পর্যন্ত মেয়ের মনোমালিন্য। কত সুখে আহ্লাদে ছিল—'

নীতা হেসে ফেলে বলে, 'আহ্লাদে হয়তো ছিল মা, তবে সুখে ছিল কি?'

'থাকবে না কেন শুনি?'

সুলেখা রেগেই বলেন।

নীতা আস্তে হেসে বলে, 'তুমি যে জন্যে থাকো না।'

'আমি —আমি সুখে নেই?'

নীতা বলে, 'আছ বুঝি? তা'হলে তো ভালোই। একটা ভুল ধারণা ভাঙল।'

সুন্দর খাট, সুন্দর বিছানা, সুন্দর বাড়ি, এ আর হতভাগা শশীমিস্ত্রীর মেয়ের ভাগ্যে জুটল না। মলিন পরিবেশ থেকেই বিদায় নিতে হল তাকে।

হাসপাতাল তাকে ছেড়ে দিল।

আজ আর শুধু গলা পর্যন্ত নয়, মুখ পর্যন্তই ঢাকা ছিল চাদরটা, সেই দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থেকে রীতা বলে. 'মানুষ কত অক্ষম দেখছেন নিখিলবাবু?'

নিখিল সেন স্তব্ধ হয়ে ছিলেন, এখন বললেন, 'সে তো প্রতিনিয়তই দেখতে পাচ্ছে মানুষ।'

'তবু অহঙ্কারেরও শেষ নেই।'

রীতা বলে, 'অহঙ্কার করে সংকল্প করেছিলাম মেয়েটাকে আমি চিরকাল—'

নাঃ, মেয়েটা সত্যিই ভারী বিবেচক ছিল। রীতার ঘাড়ে চিরকালের দায়টা রেখে দেবার জন্যে পৃথিবীতে থেকে গেল না তার আধখানা দেহ নিয়ে।···অথচ মরলও এমন সময় বুঝে যে,

এখন আর বিভাসকমল নামক লোকটাকে খুনের দায়ে কোর্টে দাঁড় করানো যাবে না। ভাগ্যই তার অনুকূল। অ্যাকসিডেণ্টের চার সপ্তাহ পরে আহত ব্যক্তি যদি জ্বর হয়ে মারা যায়, কে কাকে দোষ দেবে? দোষ দিতে গেলে তার পরিধি কোন দূর পর্যন্ত পৌঁছবে কে বলতে পারে? জেরার মুখে পড়ে হয়তো জ্বরের অন্তরালের কারণ আবিষ্কার হয়ে যাবে। কুচক্রী বিপক্ষরা প্রমাণ করতে পারে অদৃশ্য অন্তরালে পচন শুরু হয়ে গিয়েছিল তারই বিষক্রিয়ায় জ্বর।

কি দরকার অত ঝামেলায়? জোরালো ইনফ্লুয়েঞ্জা কি মৃত্যুর কারণ হতে পারে না? আর ইনফ্লুয়েঞ্জাটা কি অকারণে হতে পারে না।

বাইরে শশীর বৌয়ের উদ্দাম কান্নার রোল সমস্ত পরিবেশটাকে বিভীষিকাগ্রস্ত করে তুলছিল। ভাগ্যকে, আর হাত ফসকে পালিয়ে যাওয়া মেয়েটাকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করছিল, গেলই যদি তো সেইদিন তখুনি গেল না কেন? আশা দিয়ে নৈরাশ করল কেন? এতদিন ধরে মিথ্যে ছলনায় ভোলাল কেন? এই গোলমালের মধ্যেও রীতা নামের হেরে যাওয়া মেয়েটাও বলে, 'আমিও তাই ভাবছি কেন?'

দাঁড়িয়ে থাকা স্বল্প পরিচিত লোকটার সামনে আপন চিত্তকে উদ্‌ঘাটিত করে বলে, 'বলতে পারেন কেন? শুধু বড়লোকের সুবিধে করে দিতে?'

'সুবিধে!'

নিখিল সেন তাকিয়ে থাকেন।

রীতা বলে, 'সুবিধে ছাড়া আর কি? আর কি এখন লোকটাকে খুনের দায়ে ফেলে কোর্টে দাঁড় করানো যাবে?'

স্বল্প পরিচিত নিখিল সেন গম্ভীর গলায় বলেন, 'কোর্টে দাঁড় করানো তো আপনাকেই উচিত। আপনি আপনার স্বামীকে—'

'জানি!'

রীতা ক্লান্ত গলায় বলে, 'জানি সেকথা। তবু মনে হচ্ছে

ভাগ্যবানদের দোষের সাজা হবে না, এই নিয়মটাই চিরকাল চলবে পৃথিবীতে ?'

নিখিল সেন এই পরিস্থিতিতেও একটু হাসে, বলে, 'তা আপনাদের ভাগ্যবানও যখন তাদেরই দলে, উপায় কি ?'

সত্যিই তো উপায় কি ?

ক্ষমতাশালী ভগবান তাঁর সৃষ্ট যাকে যাকে 'ক্ষমতা' বস্তুটা দেন, তাদেরকে নিশ্চয়ই নিজজন বলে মনে করেন। অতএব তাদের সম্পর্কে নিজজনের মতই ব্যবহার করেন।

তবু—

তবু রীতা নামের বোকা অবুঝ মেয়েটা 'চাকুরী' খুঁজে বেড়ায়, আর মা-র কাছে গিয়ে পড়ে বলে, 'খুনীর ভাত খেতে পারা যাচ্ছে না মা। যে কদিন না চাকরী জোটে, একটু থাকতে খেতে দাও।'

'আর তোর মেয়ে ?'

'মেয়ে ? গরীবের মত থাকতে পারলে, মায়ের কাছে থাকবে, বড়লোকের মত থাকতে চাইলে বাপের কাছে থাকবে।'

'এই তোর বুদ্ধি ?'

না, এটা তোমার বুদ্ধিহীন মেয়ের বুদ্ধিহীনতা মা।

অমরলতা

চার চারটে বছর পরে অদ্ভুত একটা খবর আনল প্রাণকেষ্ট।

যে খবরটা বংশীকে পাথর করে দিল।

সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন, তবে প্রাণকেষ্ট তার গা ছুঁয়ে বলেছে, 'এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি বংশীদা, 'আমি নিজের চোক্ষে পষ্ট পেত্যক্ষ দেখেছি। আমি চিনবনা কাজল বৌদিকে? আর সেই গলা সেই গান। আর এতটুকু তো টস্‌কায়নি, বরং জৌলুস যেন আরো বেড়েছে। আমি ইচ্ছে করে চেনা দিইনি, গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে এসেছি। সত্যি বলতে বংশীদা, গলা শুনে মাথার মধ্যে চড়াৎ করে উঠেছিল, কিন্তু দেখে যেন গাটা ছমছম করে উঠল। আড়াল থেকেই কেটে পড়লাম।'

প্রাণকেষ্ট বৈতরণীর ওপারে যায়নি, গিয়েছিল শুধু তার মাসির ছেলের বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে সেই ছেলের শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে, অথচ প্রাণকেষ্ট একটা পরলোকগতার খবর নিয়ে এসেছে।

কাজল নামের যে টাটকা যুবতী মেয়েটা চার বছর আগে বরের ওপর অভিমান করে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে অবশেষে তার দিদির বাড়ি পেঁৗছে আত্মহত্যা করে মরেছিল, প্রাণকেষ্ট তাকে 'কড়েয়া গোবিন্দপুর' নামের এক গণ্ডগ্রামের মধ্যে এক বিয়ে বাড়ির উৎসবের পরিবেশে দেখে এসেছে আরো টাটকা আরো রসালো মূর্তিতে।

সেই গল্পই করছে এসে।

যদিও ওসব জায়গায় এখনো আব্রুটাব্রু আছে, এখনো বৌ-ঝির বরযাত্রীদের সামনে বেরোয়না, যা বাচালতা ওই বেচারী বরটাকে নিয়েই করে, কিন্তু তেমন মুখরা প্রখরারা ঘোমটার মধ্যেই নাচে, দরজার আড়াল থেকে শব্দভেদী বাণ ছোঁড়ে।

বরকে উদ্দেশ্য করে তার সঙ্গে আসা বন্ধুদের নামে ছড়া কাটে,

ব্যাখ্যানা করে, এবং তর্জা লড়ার ভঙ্গীতে 'ওতোর' গাইতে চ্যালেঞ্জ দেয়।

প্রাণকেষ্ট দরজার এপার থেকে তেমনি এক ছড়া শুনতে পেয়েছিল। মাসতুতো ভাইয়ের শ্বশুরের ওই পৈতৃক ভিটেটা পুরনো ঝরঝরে হলেও মাপে যথেষ্ট বড়। বাসর ঘরের সামনের বিরাট দরদালানটায় প্রাণকেষ্টর দল ভীড় করেছিল, এবং প্রবল দাবি জানাচ্ছিল তারা বাসর ঘরে ঢুকবে, কিন্তু হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়তে সাহস করছিল না। কারণ একজন বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলা তাদের নিবৃত্ত করতে চুপি চুপি জানিয়ে গিয়েছিলেন এবাড়িতে ওসবের রেওয়াজ নেই। বাড়ির কর্তারা যদি শোনেন বরযাত্রী ছোকরার দল জোর করে বাসরে ঢুকে পড়েছে, তাহলে নতুন কুটুম বলে রেয়াৎ করবেন না। এদের এখন অবস্থা পড়ে গেছে, কিন্তু বংশ-মর্যাদা জ্ঞান টন্‌টনে আছে। হয়ত ওই পড়ে যাওয়ার কারণেই বেশী আছে।

কিন্তু রেলগাড়ি চড়ে বন্ধুর বিয়ের বরযাত্রী আসা ছোকরারা অতো সহজে একেবারে নিবৃত্ত হতে পারেনা। হলে তাদেরও প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যায়—তাই তাদের মধ্যে বেশী ঠোঁটকাটা দু' তিনজন বরকে উদ্দেশ্য করেই চেঁচাচ্ছিল, 'এই শালা রাজেন, বাসর ঘর থেকে বৌয়ের গাঁটছড়া খুলে একবার বেরিয়ে আয় না। শুনি তোর নিজ মুখে তোর শ্বশুরবাড়ির রীত নীত। বাসরে ঢুকবনা তো কি 'এই' পচা গাঁয়ে শুধু চারটি লুচি মণ্ডা খেতে এসেছি ?···তুই নবাব তাকিয়ায় ঠেশ দিয়ে শালিদের হাতের মিঠে মিঠে কানমলা খাবি, আর আমরা হতভাগারা বোঠকখানা বাড়ির দালানে শুয়ে শুয়ে মশার কামড় খাব ?'

ঠিক এই সময়টাতেই হঠাৎ একটা মিষ্টি মেয়েলি গলার সুরঝঙ্কার শোনা গেল—

'বাসর ঘরে কিসের তরে
ঢুকতে চাও হে বঁধু,
ভাবছো বুঝি মজুৎ হেথায়
সদ্য চাকের মধু !

ঢুকলে এসে মৌমাছি হে
ভাঙবে তোমার ভুল,
দেখবে—'ছটাক' মধু সাথে
ষোলো ছটাক হুল।'

শোনবামাত্রই প্রাণকেষ্টর মাথার মধ্যে চড়াৎ করে উঠেছিল, সারা শরীরের রক্ত ঝিনঝিনিয়ে উঠেছিল।

এ গলা এ সুর যে তার বড় চেনা।

কিন্তু কী করে সম্ভব?

প্রাণকেষ্টকে কি 'ভূত পেতনী' বিশ্বাস করতে হবে? প্রাণকেষ্ট নিথর হয়ে আরও কিছু শোনার জন্যে অপেক্ষা করেছিল, কিন্তু তখন তাদের দলের হেঁড়ে গলা জলধর বলে উঠেছিল, 'দোরের বাইরে থেকেই তো হুলের জ্বালা মালুম দিচ্ছে। তবে আর অন্দরে ঢুকতেই বা ভয়টা কী?'

—অন্য একটা মেয়ের গলা তার উত্তরে বলেছিল, 'ছিটেফোঁটাতেই জ্বালার মালুম? তাহলে আড়তে এসে পড়লে জ্বালায় ছটফটিয়ে চোখে আঁধার দেখতে হবে যে গো!'

অসভ্য জলধরটা বললো, 'এতো রূপসীর রূপের রোসনাইতে আঁধার ঘুচবে না?'

আর আবার সেই সুরেলা চেনা গলাটি শুনতে পেল প্রাণকেষ্ট।

'রূপের আলোয় চক্ষু ধাঁধায়
জানেনা কোন মুখ্যু?
হে নটবর, বাসরের বর,
এই কি বুদ্ধি সূক্ষ্ম?
দেখছি তোমার মিতে স্যাঙাৎ,
অরসিকের হাড়,
নিষেধ করে দাওহে, যেন—
আর বাড়ায়না বাড়।'

নাঃ সন্দেহ করার আর কিছু থাকেনি প্রাণকেষ্টর। এমন মুখে মুখে ছড়া গাঁথতে আর কে পারবে শুনি? এতখানি বয়সে আর

কোনো মেয়েছেলের মধ্যে এ ক্ষ্যামতা দেখেনি। প্রাণকেষ্ট মোহিত হত, কিন্তু বংশীর সব সময় এতো বাচালতা পছন্দ হতো না, এবং সেই অপছন্দটা লুকোবার চেষ্টাও করত না।

একদিন বংশী কাজ সেরে বাড়ি ফিরেছে সঙ্গে প্রাণকেষ্ট, দেখে কাজল গদাইয়ের থুতনী ধরে গলা ছেড়ে গান গাইছে—

'হায় কোন বিধি, এ রূপনিধির
—নাম রেখেছিল ঃদারে'—

হলেও গদাই বংশীর পিসতুতো ভাই, এবং বয়সে কাজলের থেকে ফেলে ছেড়েও ছ-সাত বছরের ছোট, তথাপি ছেলেটাকে তো 'খোকা'ও বলা চলে না। গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে।

আর সবচেয়ে ক্রোধের কথা, গদাই যাকে বলে সুঠাম সুকান্তি ছেলে, হয়তো সেই জন্যেই কাজল এই ছড়াটি বেঁধেছিল।

প্রাণকেষ্ট আর বংশী যখন উঠোন থেকে দাওয়ায় উঠছে, তখন দ্বিতীয় লাইনটা উচ্চারণ করছে কাজল—

"স্মরি ও বয়ান এ মোর পরাণ
আনচান করে সদারে—"

আর গদাই হাঁ করে কাজলের টেপা হাসিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। পা থেকে মাথা অবধি জ্বলে গেল বংশীর, বংশী প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'গদাই, বাড়ি যা! এক্ষুনি যা! লেখা-পড়া জলাঞ্জলি দিয়ে ডেঁপোমি শেখা হচ্ছে? লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর, পাজী নচ্ছার উল্লুক কাঁহাকা! যা, যা বলছি—'

বংশীর জিভের আগার অভিধানে যতোগুলো গালাগাল বাক্য ছিল সবগুলো এক সঙ্গে হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এলো।

এবাড়িটা গদাইয়ের মামার বাড়ি, যদিও মামা মামী বিগত কাহিনী, তবু মামাতো দাদা বৌদি তো আছে, কাজে কাজেই মামাবাড়িটাও আছে। অন্তত এতদিন ছিল তাই, অতএব হঠাৎ এহেন সম্ভাষণে গদাই অপমানে রাঙা হয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বেরিয়ে গেল, দোষটা যে তার নয় বৌদির, সে অনেকক্ষণ থেকেই চলে যেতে চাইছিল, বৌদি ছাড়ছিল না। সেটুকুও বলে গেল না।

বাস্তবিকই ছেলেটা লাজুক আর মুখচোরা ধরনের, কাজলই

তাকে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাচ্ছে। কিন্তু এতে কাজলের স্বার্থ কী? প্রাণকেষ্ট ভেবেছিল ওইটুকু ছেলেটাকে নিয়ে এতো রঙ্গরসে কী এতো সুখ পাচ্ছে কাজল বৌদি?

ছেলেটা চলে যেতে বংশী কাজলকে একহাত নিতে এলো।

বলল, 'পিসির ছেলেটার কাঁচামাথাটা চিবিয়ে খাচ্ছ কেন শুনি? এইসব রঙ্গভঙ্গ দেখলে ও আর এবাড়ি ছেড়ে নড়তে চাইবে, না লেখা-পড়া করবে?'

কাজল অবশ্যই নত হল না, নত হবার মেয়েই সে নয়, সেও চড়া চড়া গলায় বলে উঠল, 'তা পাকামাথা না জুটলে কাঁচা-মাথাতেই কামড় দিতে হবে। কী বলো প্রাণ ঠাকুরপো?'

প্রাণকেষ্টর ডাকনাম 'কেষ্ট', বংশীও তাই বলেই ডাকে, কিন্তু কাজল কিছুতেই 'কেষ্ট ঠাকুরপো' বলবে না। বললে হি হি করে উত্তর দেয়, 'কেষ্ট ঠাকুরপো' বলতে গেলেই মনে হয় 'কেষ্ট-ঠাকুর' বলছি! ভারী হাসি পায়। তার থেকে এ বেশ ভালো বাবা! 'প্রাণ ঠাকুরপো'! 'বলতে প্রাণটা জুড়োয়।'

বংশী পেঁচা-মুখ করে বলে, 'লোকের শুনলে কান জুড়োয়না! যতোসব বেহায়াপনা।'

'তা' কি আর করবো বল, বিধাতা যাকে যেমন গড়ে। আমায় লজ্জাবতী লতা না করে যদি বেহায়া করে গড়ে থাকে, সেটা বিধাতা পুরুষের দোষ।'

প্রাণকেষ্ট কোনোদিন বংশী বাড়িতে না থাকলে আসত না, আসত বংশীর সঙ্গেই। একই জায়গায় কাজ, একই পাড়ায় বাড়ি. প্রাণকেষ্টর আপন বলতে একটা বুড়ি ঠাকুমা, বাড়িতে চায়ের পাট নেই, তাই বংশীর সঙ্গে এখানে এসে ঢুকে চা-টা মুড়িটা খেয়ে যেতো। অবিশ্যি মাঝে-মধ্যেই চায়ের অনুপানটা নিজেই কিনে নিয়ে আসতো। তেলেভাজা পকৌড়ি কি গরম মুড়ি ছোলা ভাজা, অথবা ইস্টিশানের গোবিন্দর দোকানের ডিমের ঝাল মাংসর পরোটা।

কাজল জিনিসগুলো তিন ভাগ করতে করতে চোখে মুখে

বিদ্যুৎ খেলিয়ে বলতো. 'মিঠে হাতের চায়ের বদলা না কি গো প্রাণ ঠাকুরপো ?'

প্রাণকেষ্টও কথায় কম যায় না, সে উত্তর দিত, 'ও বস্তুর কি আর বদলা আছে বৌদি ? ও হলো অমৃত ! অমৃতর বদলা হয় না।'

তা এতে বংশীর বিরক্তি ছিল না। প্রাণকেষ্টকে সে বিশ্বাস করে। বৌকেও করে। শুধু ওই আত্মীয়জনের সমাজে বৌয়ের বেহায়াপনা বরদাস্ত করতে পারে না সে।

এই কদিন আগে পিসি বংশীকে ডেকে বলেছে—'হ্যাঁরে বংশী, বৌমার কতদূর লেখাপড়া ? গদাইয়ের তো উঁচু কেলাশ হলো। ওকে পড়াবার মত বিদ্যে আছে ?'

বংশী তো অবাক !

'একথা উঠছে কেন পিসি ?'

'বৌমাই ওঠাচ্ছে তাই উঠছে। গদাই তো গরমের ছুটি ভোর দুকুর হলেই বইখাতা বগলে করে তোর বাড়ি ছোটে বৌদির কাছে পড়তে। আগে পড়িয়েছে সে আলাদা, তখন নীচু কেলাশ ছিল।'

প্রকারান্তরে অন্য ইশারাই দিয়েছে পিসি।

বংশী অবশ্য মুখে হারেনি। বলেছে—'তা তোমাদের বৌমার পড়াশুনো আছে অনেকটা, বাংলাটা অন্তত পড়াতে পারে। তাই পড়ায় হয়তো।'

বাড়ি এসে বলেছে, 'গদা তোমার কাছে কী পড়ে ?'

কাজল অম্লান বদনে উত্তর দিয়েছিল, 'প্রেমে পড়ে।'

বংশী এইটা বরদাস্ত করতে পারে না। এই সর্বদা ইয়ার্কি। ঠাট্টা ইয়ার্কি হবে। সময়ের জিনিস, একবারও তো মানুষ সোজা কথা কইবে ? ঘরসংসারী মানুষ তারা, কাজল তার বিয়ে করা বৌ. যাত্রাদলের পালা গাইয়ে তো নয় ?

বংশী হাতের বাজারের থলি নামিয়ে কোঁচার খুঁটে ঘাড়ের ঘাম মুছে বলেছে, 'তা হলে পাঠ কেত্তনটা বন্ধই হোক। গদাইকে তোমার পড়াবার দরকার নেই।'

'আচ্ছা নেই তো নেই। তোমার ভাইকে বারণ করে দিও যেন হামলে হামলে না আসে। বুঝলে? বারণ করে দিও। আমি বলতে পারব না—'গদাই তুই আর আসিসনে—'

কিন্তু বংশীও পারেনি।

অতএব গদাই নিঃশঙ্কচিত্তে যথা নিয়মেই আসা-যাওয়া করে চলছিল।

* * *

কাজলের জবাবে বংশী কিছু না পেয়ে গায়ের জামাটাই খুলে উঠোনে টিউবওয়েলের গোড়ায় ফেলে দিয়ে বলে উঠল, 'মাথাটা কারুর খাওয়াই চাই কেমন? বলি এত খিদেটা কিসের?'

'কিসের খিদে তাই যদি বুঝবে তাহলে আর আমার দুঃখু কিসের গো? প্রাণ ঠাকুরপো বুঝলেও বুঝতে পারে। তোমার ওই ঝুনো মগজে উঁহু!'

তারপর বলল, 'জামাটা ফেলে দিলে যে? আজই না ধোপ শার্ট পরে গেলে?'

'বেশ করেছি, আমার খুশি!'

কাজল বৌ চোখে যাকে বলে বিলোল কটাক্ষ হেনে বলে ওঠে, 'মানেটা কী যে বুঝেছ প্রাণ ঠাকুরপো? পরিবারটাকে ওই ভাবে ছুঁড়ে ফেলবার ইচ্ছেটা কাজে খাটাতে না পেরে—'

প্রাণকেষ্ট তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'নিন, আপনারা তাহলে ঝগড়াই করুন আর ওদিকে চিংড়ির বেসনবড়াগুলো পান্তা হোক।'

'চিংড়ির বেসনবড়া' গোবিন্দর দোকানের একটা 'স্পেশাল'। কুচো চিংড়ি বেটে বেসনের গোলায় ডুবিয়ে এমন একখানা বানায় যে বড়ো বাগদার কাটলেটকে হার মানায়। তবে দামও নেহাৎ কম করে না।

কাজল বলে ওঠে, 'আবার আজ চিংড়ির বড়া? ও আজ 'হপ্তা'র দিন ছিল বুঝি? তা পয়সা কি তোমায় কামড়ায় প্রাণ ঠাকুরপো?'

'বাঃ, খাবার জন্যেই তো পয়সা?'

প্রাণকেষ্ট হেসে বলে, 'সারা হপ্তা খেটে মরি, একদিন একটু খাবো না ?'

'তা' খাবে তো নিজে খাবে। পাঁচ ভূতকে খাওয়ানো কেন ?'

শুনে প্রাণকেষ্ট গম্ভীর হয়ে যায়, বলে, 'এরকম কথা বললে আর আসব না।'

বংশীই তখন মধ্যস্থতা করে প্রাণকেষ্টর অভিমান ভাঙায়। বলে—

'আচ্ছা ওটাকে অমন ক্ষ্যাপাও কেন বল তো ?'

কাজল হেসে হেসে বলত, 'ক্ষেপে ওঠা পুরুষ দেখতে বেজায় আমোদ লাগে আমার।'

কাজলের সব কথাতেই যেন একটা অন্তর্নিহিত রহস্য আছে।

প্রাণকেষ্ট যদি বলত, 'একা বসে খেলে তাড়ির দোকানে গিয়ে খাব। বাড়ি নিয়ে গিয়ে ঠাক্‌মার সামনে বসে নয়—'

কাজল অনায়াসেই বলল, 'ও বাবা তাই নাকি ? তবে তো আমি তোমার পরম হিতুষী ! আর তাড়ির নেশা কাটাবার ক্ষমতা রাখি।'

বংশী তাড়া লাগাত, 'থামো, থামো, চা-টা বানাও আগে।'

'বানাচ্ছি বাবা বানাচ্ছি ! লোকটা এমন কাঠ যে একটু রসের কথা কানেও সয়না !'

প্রাণকেষ্টর যে এসব ঠাট্টা-তামাসা ভালো লাগতো না তা নয়, তবে বংশীদার ওপর তার ষোলোআনা প্রাণ। বংশীদা যা দেখতে পারে না, কাজল বৌদি সেটাই সর্বদা কেন করে ভেবে মাঝে মাঝে তার কাজল বৌদির ওপর রাগ ধরত। বিশেষ করে তাকে নিয়েই যখন পড়ত কাজল।

আর একদিনের কথা মনে পড়ছে প্রাণকেষ্টর। মনে পড়েছে বংশীরও।

প্রাণকেষ্ট সেদিন সকালে ছিপ্ ঘাড়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল। সন্ধ্যেবেলা ধপাস করে একটা বড়সড় পাকা রুই এনে উঠোনে ফেলে দিয়ে বলে উঠল, 'প্রাণকেষ্টরও দুটো চাল নিন বৌদি। এখানেই

খ্যাটটা হোক। তোফা গরম গরম মাছভাজা আর সর্ষের তেল ঝাল।'

বলেই উঠোনের গাছ থেকে পট্ পট্ করে গোটাকতক কাঁচা লঙ্কা ছিঁড়ে দাওয়ার ধারে রাখল।

কাজল বেরিয়ে এল।

গালে হাত দিয়ে বসল, ও বাবা! এ যে দেখছি গভীর জলের মাছ! কোন্ সরোবরে মাছ ধরতে গিয়েছিলে গো প্রাণঠাকুরপো?'

প্রাণকেষ্ট হাত ধুতে ধুতে তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, 'কোথায় আবার? ঘোষেদের তালপুকুরে। প্রথম দিকে তো—বংশীদাও বসেছিল, তারপর ওভারটাইমের জন্যে নাড়ি নেচে উঠতে চলে গেল। আমি বাবা ওই ছুটির সময়টুকু মেরে ওভারটাইম খাটতে যাই না।'

কাজল ঠোঁট উল্টে ভুরু নাচিয়ে বলে, 'তালপুকুরে শুনি ঘটি ডোবে না, এতো বড়ো পাকা রুইটা ডুবে বসেছিল!...দেখে তাজ্জব লাগছে।'

প্রাণকেষ্ট অপ্রস্তুত হয়েও হয়না, তাড়াতাড়ি বলে, 'ঘোষেদের তালপুকুরে এখনো অগাধ জল বৌদি।'

'ও তাই বুঝি?'

বলে উঠোনে নেমে শাড়ির আঁচলটা সাপটে নিয়ে আঁশবটিটা পেতে মাছটার গায়ে হাত বুলিয়ে সুর করে গেয়ে ওঠে,

'ও আমার গভীর জলের রুই—
কোথায় ছিলি, কেনই হেথায়
মরতে এলি তুই?'

হাতটা এমনভাবে বুলোয়, যেন কোনো মানুষের গায়েই হাত বুলোচ্ছে।

বংশী হাত মুখ ধুতে টিউবওয়েল থেকে বালতিতে জল ভরে নিয়ে উঠোনোর কোণের 'ঘের' এর মধ্যে ঢুকে গেছে তখন প্রাণকেষ্ট গলা নামিয়ে বলে, 'আচ্ছা বৌদি, আপনি এমন কথায় কথায় পদ্য ছড়া বানিয়ে ফেলেন কী করে বলুন তো?'

'ভগবানদত্ত ক্ষমতা হে প্রাণঠাকুরপো।'

'তা' হলেও কথাগুলোও তো শিখতে হয়েছে? সেই তো কোন অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—'

কাজলের চোখটা হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

কাজল তীক্ষ্ন স্বরে বলে, 'তোমাদের ধারণা অজ পাড়া গাঁয়ে শুধু 'অজ'ই থাকে কী বলো? মানুষ থাকে না? অজ গাঁয়েও রসের মানুষ থাকতে পারে গো, ভাবের মানুষ থাকতে পারে।'

'তার মানে শিক্ষাদাতা গুরু পেয়েছিলেন? তা আপনি যদি একটা তর্জার দল খুলে ফেলেন, নাম ডাক হবে। পয়সাও উঠবে।'

কাজল গম্ভীরভাবে মাছটার আঁশ ছাড়াতে ছাড়াতে বলে, সেইটাই আজন্মের সাধ বুঝলে ভাই! তোমাদের এই না শহর না পাড়া গাঁ। দো আঁশলা জায়গায় শুধু ভাত রাঁধছি, মাছ কুটছি, বাটনা বাটছি, এই নিয়ে জীবন কাটিয়ে যাব ভাবতেই দুঃখে প্রাণ ফেটে যায়।'

'তা' বেশ তো খুলে ফেলুন একটা?'

কাজল মাছে কোপ দিয়ে জোর গলায় বলে, 'ওই যে তোমার রসের সাগর দাদাটি? ওনার সঙ্গে এসব পরামর্শ চলবে?'

বংশী 'ঘের' এর মধ্যে থেকে সবই শুনতে পায়। বংশী চেঁচিয়ে বলে, 'তা' ঘরের বৌয়ের খ্যামটা নাচের পরামর্শটা চলবে না বটে বংশীবদনের সঙ্গে। কী করবো নিরুপায়।'

'সেই তো!' কাজল মাছগুলো ফালি ফালি করতে করতে বলে, 'নিরুপায়ের বড়ো যন্ত্রনা। যেমন এই মাছটা। নিরুপায় বলেই না একজন ওকে এমন টুকরো টুকরো করে কেটে কেটে হাতের সুখ করে নিচ্ছে।'

'আর পাঁচজনে জিভের সুখ করবে—'

প্রাণকেষ্ট আবহাওয়া হালকা করতে যেয়ে বলে কথাটা।

কাজল বলে, 'সেই তো! মাছটার ক্ষ্যামতা থাকলে নির্ঘাৎ কানে হেঁটে ঘষটে গিয়েও ফের সেই গভীর জলে গিয়ে পড়ে বাঁচতো!'

বংশী গামছা ঝাড়তে ঝাড়তে বেরিয়ে এসে বলে 'তক্ককথার বদলে চায়ের সঙ্গে দু'খানা গরম মাছ ভাজা পেলে এই হতভাগারা খেয়ে বাঁচত, কী বলিস কেষ্ট?'

কাজল তাড়াতাড়ি মাছগুলো ধুয়ে নিতে নিতে গলা পালটে বলে, 'ভাল কথা, মাছটা কোন বাজার থেকে আনলে ঠাকুরপো ? না কি হাটে গিছলে ?'

'ও মা সে কী ! মাছটা ধরে আনলাম না ঘোষেদের পুকুর থেকে ?' বলে বংশীর চোখে চেয়ে হাসি চাপে প্রাণকেষ্ট।

কাজল সেদিকে তাকিয়ে দেখে না।

কাজল অমায়িক গলায় বলে, 'সত্যি বলছ ? তা তোমার চারটার রহস্য আমায় একটু বলে দাও না ভাই, যাতে ছিপ ফেললে পানা পুকুর থেকেই নদীর মাছ ওঠে।'

এই রকম কথা কাজলের।

সব কথাতেই যেন রহস্যের আভাস।

প্রাণকেষ্ট কতো কথার সাক্ষী !

সেই প্রাণকেষ্ট কাজলকে ভুল দেখবে ?

প্রাণকেষ্ট তার মাসির দেশ ফেরৎ স্টেশন থেকে সোজা এখানেই এসেছিল, এখন গা হাত ধুতে বাড়ি গেল।

বংশী দাওয়ার কোণে বালতির উনুন জেবলে রুটি সেঁকছিল। খানকয়েক হয়েছে, বাকিটা পড়ে আছে। প্রাণকেষ্ট চলে যেতেই বংশী সেই বাকি তালটা উঠোনের বেড়া টপকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জ্বলন্ত উনুনটায় এক মগ জল ঢেলে দিয়ে দাওয়ার ধারে গুম হয়ে বসল। যে কখানা রুটি সেঁকা হয়েছিল, সে ক'খানাও উনুনের ছাই আর জল লেগে অখাদ্য হয়ে গেল। বংশীর চুলে মুখে গায়ে ভস্মকণা উড়ে লেগে বংশীকে যে কেমন কিম্ভুতকিমাকার দেখতে লাগছে, তা খেয়াল করলনা।

বছর দুই হল প্রাণকেষ্টর ঠাকুমা মারা গেছে, হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে অক্ষম প্রাণকেষ্ট অগত্যাই একটা বিয়ে করেছে। পাড়ার লোক বলে 'সেই বিয়েই করলে কেষ্ট, শুধু বুড়িটাকে শেষদিন অবধি রাঁধিয়ে মারলে।'

প্রাণকেষ্ট কপালে হাত ঠেকিয়ে জবাব দিয়েছে, 'নসীব।'

কার নসীব তা' অবশ্য বলেনি।

সে যাক—বিয়ে করেই প্রাণকেষ্ট বলেছিল, 'তুমিই বা হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাবে কেন? এক রান্নাঘরেই হোক না দু'জনের?'

বংশী রাজী হয়নি।

বলেছে, 'নাঃ! যা চলছে চলুক। ছেলেমানুষ বৌটার ঘাড়ে মেলা ঝঞ্ঝাট চাপাবি কি জন্যে?'

প্রাণকেষ্ট বংশীর বিপক্ষে এবং নিজের সপক্ষে অনেক যুক্তি খাড়া করেছে, অনেক সাধ্যসাধনা করেছে, বংশী তাকে নিবৃত্ত করেছে। বংশীর সেই এককথা—'যা চলছে চলুক।'

কথাটা যদিও অ-চলের নামান্তর।

বংশী ওই উনুনটা জেবলে কোনোদিন একহাঁড়ি ভাত রেঁধে দু'বেলা খায়, কোনোদিন এক কৌটা আটার রুটি সেঁকে দু' বেলা খায়।

উপকরণ?

নাঃ তার জন্যে খাটে না বংশী, সেটা গোবিন্দর দোকান থেকেই এনে চালায়। আর যেদিন ওই উনুনটাও ধরাতে ইচ্ছে করে না, নিজেকেই নিয়ে গিয়ে পেঁছে দেয় দোকানটায়। ভরিয়ে নেয় পেটটা। এই চালানো বংশীর।

সবাই বলাবলি করে, 'বৌটা গিয়ে অবধি বংশীর মাথাটাই গোলমাল হয়ে গেছে। নইলে জোয়ান পুরুষ তুই, এই বয়সে আর একটা বিয়ে করতে পারলিনা?'

গোপনে বলে, 'সেই তো ঢলানি বৌ ছিল, কখন সংসারের আয় উন্নতির দিকে তাকিয়ে দেখেনি, খেয়েছে মেখেছে সেজেছে, নেহাৎ না দিলে নয় তাই স্বামীকে দুটো ভাত রেঁধে দিয়েছে। তা'ও 'মরণ'টা কেমন মরণ ভগবান জানে।'

এইখানেই ভয়ঙ্কর একটা নালিশ বংশীর ভাগ্যের কাছে।

বাঁচা-মরার ওপর হাত নেই, যে যত দিনের মেয়াদ নিয়ে আসে। কাজলের যদি দিন ফুরিয়ে ছিল বলার কিছু ছিলনা ভগবান, তোমার জিনিস তুমি নিয়েছ। কিন্তু নিলে যখন তখন এমন করে নিলে কেন ঠাকুর? এই জুড়নপুরের মাটিতেই মাটি হোকনা

কেন তার শরীর ? দেশে রাজ্যে সবাই জানত আর মানত কাজল মরে গেছে।

তা তো হলনা, কাজল চিরদিন যেমন রহস্যাবৃত রেখে কথা বলত, তেমনি তার মৃত্যুটাকেও রহস্যাবৃত রেখে গেল।

খুঁটিতে ঠেশ দিয়ে গুম হয়ে বসে অনেক দিন পরে আবারও বংশী সেদিনের ঘটনাটা পুঙ্খানুপুঙ্খ করে ভাবতে বসল।

কাজল মরে যাওয়ার পর ওইটাই একমাত্র কাজ হয়েছিল বংশীর, তিল তিল করে ভাগ করে প্রতি মুহূর্তটিকে স্মরণে এনে চিন্তা করতে বসা।

সেই তো রাত্রে শুয়ে পড়লো কাজল না খেয়ে, বংশীও রাগ করে জিগ্যেস করতে পারলেনা—'খেলেনা কেন ?'

অথচ মনের অশান্তিতে ঘুমোতে পারছেনা।

অনেকক্ষণ উসখুস করে একসময় বলেই ফেলল, 'খাওয়া হল না কেন ?'

উত্তর এলনা।

একটু চুপ করে থেকে বংশী আবার বলল 'খেয়ে নিয়ে যতো ইচ্ছে রাগ করলে ভাল হতোনা ?'

তখন কাজল মুখ খুলেছিল।

হঠাৎ একটু যেন হেসে বলেছিল, 'মোটা বুদ্ধির লোকেরা রাগ ছাড়া আর কিছু দেখতে পায়না।'

এরপর আর কোন পুরুষছেলের কথা বলতে ইচ্ছে করে ?

অতএব সেই শেষ কথা কাজলের সঙ্গে।

আর তার আগের কথা হচ্ছে বাড়ি ফেরার মুখে বাইরে থেকে কাজলের খোলা গলার গান শুনতে পেয়ে বংশী বাড়ি এসে বলেছিল, 'তোমার মামা যে কেন তোমায় থিয়েটার কেত্তনের দলে ভর্তি না করে গেরস্থ ঘরে বিয়ে দিয়েছিল তাই ভাবি। মোড়ের মাথা থেকে গেরস্থর বৌয়ের গলা শোনা যাচ্ছে।'

'গেলেই বা'—কাজল একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বলেছিল, 'গলা তুলে ঝগড়া করা তো হচ্ছিলনা কারুর সঙ্গে তোমার পিসির মত ?

গান তো গলা খোলবারই জিনিস। ভগবানের গান গাইছি লজ্জা কী? কেন শুনতে খারাপ লাগছিল?'

বংশী যতটা না ক্ষেপত, ক্ষেপলো তার পিসির উল্লেখে। বেহায়া মেয়েমানুষের একেই লজ্জা নেই, তার উপর আবার আসপদ্দা। গুরুজনের নাম তুলে খোঁটা।

বংশী নিজেকে সামলাতে পারলনা, চেঁচিয়ে ধমক দিয়ে উঠল, 'খবরদার মুখ সামলে, ফের যদি আমার মা পিসির নাম নিয়ে কথা বলতে শুনি জন্মের শোধ কথা বলা ঘুচিয়ে দেব।'

কাজল হঠাৎ চুপ করে গেল।

তার সেই লীলা চাপল্যের ভঙ্গী অন্তর্হিত হল, কাজল তারপর একটু ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলল, 'কী করে? গলা টিপে মেরে দিয়ে?'

বংশী হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হল।

বংশী একটা রূঢ় কটু কথা বলে বসল। বংশী বলল, 'মেরে ফাঁসির রাস্তা পরিষ্কার করতে যাব কেন? জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বাক রোধ করে দেব।'

কারখানায় সর্বদা ছোটলোকদের সঙ্গে কথা বলে বলে বংশী নামের ভদ্রঘরের ছেলেটার কথাবার্তা ছোটলোকের মত হয়ে গেছে।

কথাটা বলে ফেলেই নিজের জিভটা টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে করছিল বংশীর। কাজলের ব্যবহারই তাকে মাঝে মাঝেই এমন ক্ষেপিয়ে দেয়, নইলে কাজল তো তার প্রাণ।

এ তল্লাটে এমন একখানা বৌ আর কারো ঘরে আছে? গানের গলাও সত্যিই আসরে গাইবার মতো! তবু ঘরের বৌ তো? রাস্তা থেকে গান শোনা গেলে গা রী রী না করে পারে?

কথাটা বলে ফেলেই লজ্জায় কুণ্ঠায় আর একটা কথা বলে ফেলে বংশী।

যেন স্বগতোক্তিই করে।

'বলবই বা কী? সংসারে দ্বিতীয় প্রাণীও তো নেই একটা! কাঁহাতক মুখ বুজে থাকতে পারে মানুষ? আর দুটো প্রাণীর কাজই বা কত! বাঁজা মেয়ে মানুষের উদয়াস্ত অবকাশ।'

তোয়াজী কথাই।

যেন ওই অবকাশের চাপে হাঁপিয়ে উঠেই বেচারী কাজল একটু গান গেয়ে হালকা হয়। অর্থাৎ রাগের মাথায় দু'কথা বলে ফেললেও বংশী কাজলের অবস্থা বোঝে।

কিন্তু হিতে বিপরীত হলো।

কাজল একথায় বারুদে আগুন ধরার মতো দপ্ করে জ্বলে উঠল।

কাজলের মুখ লাল হয়ে গেল।

কাজল গলার স্বরটাকে ভীষণ করে বলে, 'বাঁজা মেয়েমানুষ? ওঃ! নিজের গল্তি অন্যের ওপর চাপিয়ে জগৎকে ফাঁকি দিতে পারা যায়, কিন্তু নিজের বিবেককে ফাঁকি দিতে পারবে?'

বংশী থতমত খেয়ে বলে, 'তার মানে?'

'তার মানেটা যে কী তুমি ভাল মতই জানো।'

'কী বলতে চাও তুমি?'

'যা বলতে চাই, তা তোমার মনকেই জিগ্যেস করো।'

বলে রান্নাঘরের মধ্যে চলে গেল কাজল।

তখন ওই পর্যন্ত।

রাত্রে শুধু ওই কথাটা।

বংশী দুহাতে দু'রগের শির চেপে ধরে মাথাটা হেঁট করে চোখ বুজে ভাবতে থাকে।

যে ভাবনাটা আস্তে আস্তে ঝাপ্সা হয়ে আসছিল, সেটা ভয়ংকর-ভাবে নাড়া খেয়ে যেন জলের নীচে থেকে ভেসে উঠেছে।

রাত্রির পরটা কী?

সকাল।

তাছাড়া কী?

পরদিন সকালে বংশী ঘুম থেকে উঠে দেখল কারখানায় যাবার সময় প্রায় পার হয়ে গেছে।

এর মানে?

কাজল ডেকে দেয়নি মানে?

ওঃ, সেই গতকালকের রাগ!

আচ্ছা ঠিক আছে, বংশীও এ রাগের শোধ নেবে। জলস্পর্শ পর্যন্ত না করে বেরিয়ে যাবে।

রাগ!

ওনারই শুধু রাগ করার অধিকার আছে, আর কারুর নেই! কেন তুমিই কি কিছু কম মন্দ কথা বলেছো? বংশী হতভাগা কারখানার কুলি বলে ওর আর মান মর্যাদা নেই?

বংশী তখন টিউবওয়েলের ধারে গিয়ে বেশ সশব্দে সবেগে হাতমুখ ধুয়ে-নিয়ে জোরে জোরে গামছা ঝাড়লো।

কোনখান থেকে কোনো সাড়া নেই।

তার মানে রাগ দেখাতে গা ঢাকা দিয়ে আগানে বাগানে বসে আছে। ওঃ কী নিষ্ঠুর মেয়েমানুষ! স্বামীর খাবারটা পর্যন্ত ঠিক করে রেখে না গিয়ে—

আচ্ছা বংশীও মেজাজ দেখাতে জানে।

বংশী ধড়াচুড়ো পরে গলা তুলে বললো, 'আজ আর দুপুরে খেতে আসছি না। আসার ভাত রাঁধার দরকার নেই।'

বাড়ি নিঃসাড়।

কোথাও কোন উত্তরের আভাস নেই।

রাগে মাথা জ্বলে গেল বংশীর।

তার মানে—এই ভোর সকালেই কোনো পেয়ারের বান্ধবীর বাড়ি গিয়ে বসে থাকা হয়েছে। হয়ত বরকে কেমন জব্দ করেছে, তাই নিয়ে দুই সখীতে হাসাহাসি করছে। ঠিক আছে, বংশীও জব্দ করতে জানে। বংশী ঘরের দরজাগুলোয় খিল ছিটকানি লাগিয়ে দাওয়ার ওপরকার প্রধান দরজাটায় একটা ভারী তালা ঝুলিয়ে দিয়ে গট্‌গট্‌ করে বেরিয়ে গেল।

ভাত রাঁধতে বারণটা যখন শুনতে পায়নি, তখন দুপুরবেলায় আসতে বাধা নেই। আসবে বংশী, এবং যখন দেখবে রাগে মুখ ভারী করে দাওয়ায় বসে আছে কাজল, তখন বলে দেবে, 'তা কী করা যাবে? বাসাটাকে তো চোর ডাকাতের হাতে ফেলে দিয়ে চলে যেতে পারি না?'

কিন্তু কারখানায় গিয়ে ফোরম্যান বংশী সরকার কাজে মন

দিতে পারে না।' কেমন একটা আতঙ্ক তাকে চেপে ধরে। বাড়ি ফিরে কাজল যখন দেখবে দরজায় তালা, কী করবে কাজল? রাগী মেয়েমানুষ, রাগের মাথায় যদি—

'ঘোষেদের তালপুকুরে' কালচে নীল গভীর জলটার ছবি চোখের ওপর ভেসে উঠল বংশীর। বংশী 'শরীর খারাপ লাগছে' বলে কাজের জায়গা থেকে বেরিয়ে এল।

তারপর হনহনিয়ে সোজা বাড়ি।

দরজায় এসে থমকে দাঁড়াল বংশী. দরজাটা একইভাবে তালা গলায় বেঁধে নিথর দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কোথাও বসে নেই। কেউ বসেছিল তার যেন চিহ্নও নেই।

বংশী বাড়ির পাশ দিয়ে পিছনের ছোট দরজাটা দেখতে গেল, যথারীতি ভিতর থেকে বন্ধ। বংশীর বুকটা ছমছম করে উঠলেও উঠোনের পাঁচিলের ওপর তড়াক করে লাফিয়ে ভিতরটা দেখে নিল। না, কোথাও কোন জীবন্ত প্রাণীর চিহ্ন নেই। টিউবওয়েলের ধারে বালতিটা তেমনি কাৎ হয়ে পড়ে আছে, যেভাবে রেখে গিয়েছিল বংশী! রাগ দেখাতে বালতিটা আছড়ে ফেলে শব্দ করেছিল।

বংশী হঠাৎ দাওয়ায় বসে পড়ে কপালে হাত চাপড়ে চাপড়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল। তারপর হাতে মুখে খুব খানিক জল থাবড়ে গেল পিসির বাড়ি। যদিও পিসি কাজলকে দু'চক্ষে দেখতে পারেনা, তবু যাওয়া আসা তো আছে।

কিন্তু যাওয়া মাত্রেই পিসি বলে উঠল. 'ভোরের বেলায় দোরে তালাচাবি লাগিয়ে স্বামী-স্ত্রী কোথায় যাওয়া হয়েছিল বংশীবদন? সকালে ফুল তুলসী নিতে গিয়ে তাজ্জব।'

বংশীর মনে পড়ল রোজ সকালে পিসি বংশীর বাড়ির উঠোন থেকে ফুল তুলসী নিয়ে আসে। কাজলের বড় শখ।

বংশী শুকনো মুখে বলল. 'না পিসি, ব্যাপাটা ঠিক তা নয়—

তারপর বংশী ব্যাপারটা বোঝাল এবং নিজের গোঁয়ার্তুমীর ওপর দশগুণ রং চড়িয়ে নিজেকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাল।

পিসি শুনে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'দ্যাখ আবার আত্মঘাতী হল কি না। যে মেজাজ তোর বৌয়ের।'

বংশীর পায়ের তলার মাটি সরে গেল, বংশী চোখে অন্ধকার দেখল।

তারপর আর কী!

পাড়ারাজ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেল বংশীর বৌ ঘর ভেঙে পালিয়েছে।

তাছাড়া আর কি!

জলে ডুবে মরলে এতদিনে তার লাশ ভেসে উঠত না?

কোন গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলেনি, রেল লাইনে কাটাও পড়েনি। অতএব?

যন্ত্রণার ওপর কলঙ্ক।

বংশী ছটফটিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছে, প্রাণকেষ্টই নিবৃত্ত করেছে, 'কী বলো বংশীদা? হয়ত রাগ করে মাসি পিসির বাড়ি কোথাও লুকিয়ে আছেন, রাগ পড়লে চলে আসবেন, এসে যদি দেখেন, ঘর নেই বাড়ি নেই তুমি নেই?'

অবস্থাটা বুঝেছে বংশী, থেকে গেছে।

তারপর দিন কুড়ি পর মেমারি থেকে বংশীর এক মাসতুতো শালীর চিঠি এল। জরুরী চিঠি।

'কয়েকদিন হইল কাজল এইখানে আসিয়া রহিয়াছে। ভাবে ভঙ্গীতে মনে হয় তোমার সহিত কলহ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। পত্রপাঠ চলিয়া আসিয়া ভুলাইয়া ভালাইয়া লইয়া যাও।'

ইতি—
লীলাদি

মামার বাড়ি মানুষ হওয়া সূত্রে এই মাসতুতো দিদির বাড়িতেও অনেক দিন থেকেছে কাজল, অবশ্য কুমারী বেলায়। তখন রাগ করে গিয়ে আশ্রয় নেবার জন্যে ওই লীলাদির বাড়িটাই মনে এসেছে তার, এটা অস্বাভাবিক নয়।

চিঠিখানা বংশী প্রাণকেষ্টকে দেখাল। দেখাল পিসিকে, তারপর পরামর্শ চাইল।

কী আর পরামর্শ দেবে লোকে?

বলেছে 'যাও নিয়ে এসো।'

পিসি বলেছে 'তবু রক্ষে যে আত্মঘাতী হয়নি। থাক্ যাও

এখন ফুল-চন্দন দিয়ে পা পুজো করে পরিবারকে নে' এসো শালির বাড়ি থেকে। যেমন মেনিমুখো তুমি।'

'পৌরুষোচিত' ব্যবহার করতে গিয়েই যে বৌ হারাল একথা আর বলল না বংশী। নীরবে চলে এল।

প্রাণকেষ্টকে নিয়ে মেমারি গেল বংশী।

ব্যস সেখানে মাথায় বজ্রাঘাত!

লীলাদি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বলল, 'ভাই তোমার কাছে দেখাবার মত মুখ আমার নেই। সর্বনাশী যে এরকম করবে তা বুঝিনি।'

আবেগ প্রশমিত হতে অনেক সময় লাগল। তারপর যা জানা গেল তা এই—লীলাবতী নিতান্ত সন্তর্পণে লুকিয়ে চিঠিটা দেওয়া সত্ত্বেও কেমন করেই যে কাজল জেনে ফেলল তাকে ধরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। সেই রাত্রেই দিদির নামে চিঠি লিখে রেখে হাওয়া কাজল নামের রূপসী যুবতী মেয়ে।

'দিদি, তোমার কাছে এসেছিলাম দুদিন জ্বালা জুড়োতে, তুমি ষড়যন্ত্র করছো ধরিয়ে দেবার জন্যে। মা থাকলে কখনো এমন করত না। যাক্ মা নেই, মা গঙ্গার কোল তো আছে? একটা সাড়ে তিন হাত মানুষকে লুকিয়ে রাখবার ক্ষমতা তাঁর আছে। প্রণাম নিও।'

কাজল।

কাজল লেখা-পড়া জানে, লীলা জানে না। লীলা বলল, 'অপরকে পাড়িয়ে শোনা, তোমরা আর একবার পড়ো শুনি।'

শুনতে শুনতে লীলা কাঁদতে লাগলো ইনিয়ে বিনিয়ে সুর করে। যার অর্থ হচ্ছে—'সর্বনাশী কাজল একবার দিদির মুখ চাইল না। বংশীর সামনে দিদি কোন মুখ নিয়ে দাঁড়াবে ভাবলনা। দিদি তোর শত্রু? আর মা থাকলে মা তোকে লুকিয়ে রাখত? সোয়ামীর ঘরে ফেরৎ দেবার চেষ্টা করত না?'

এইসব কথা।

বংশী আর প্রাণকেষ্ট ফিরে এল অস্নাত অভুক্ত। লীলার হায় হায়-এ কর্ণপাত করল না।

চিররহস্যময়ী কাজল এক রহস্য হয়ে রইল। কোথাকার গঙ্গায় কাজল তার কোমল সুকুমার সাড়ে তিনহাত মাপের দেহখানা লুকোতে গিয়েছিল, তার তো হদিস দিয়ে যায়নি? কোথায় খুঁজবে বংশী?

তবু কত কতদিন ধরেই খুঁজল বংশী।

কিন্তু কাজল নামের সেই দীপ্ত বিদ্যুৎ শিখাটিকে পেল না।

তবু কলঙ্কটা গেল।

অন্ততঃ বংশী তাই ভাবল।

প্রাণকেষ্টকে দিয়ে পিসির কাছে বার্তাটা জানাল, আর ভাবল কাজল এবং বংশী কলঙ্ক মুক্ত হল।

ও বার্তা শুনে জনেজনে যে জানতে চাইল 'লাশ' দেখে এসেছে কিনা তারা, সেটা আর প্রাণকেষ্ট বংশীকে বলল না।

অতএব অবস্থা একই থাকল।

বংশী সরকারের বৌটা হারিয়ে গেছে।

পিসি বলেছিল, 'আমার কাছে খা।'

বংশী মাথা নাড়ল।

'ও আমি চালিয়ে নেব।'

পিসি বলল 'তা' এই বয়েস থেকে কি তুই বৈরাগী হয়ে থাকবি? আর একটা বিয়ে কর।'

বংশী বলেছিল, 'আবার মেয়েছেলের গাড্ডায়?

পিসি তবু বলল, 'তোর কথা আমি শুনব না, মেয়ে দেখি। বাঁজা বৌ গেছে এবার তোর ঘর কাচ্চাবাচ্চায় ভরে উঠবে।'

বংশী ধরা গলায় বললে, 'মিথ্যে চেষ্টা কোর না পিসি! কেন লোকের কাছে অপমানী হবে?'

পিসি ভাইপোর কাছেই এই অপমানটা লাভ করে তার হিত চেষ্টা ছাড়ল।

তদবধি বংশী 'চালিয়ে নিচ্ছে'। 'চালিয়ে চলছে।'

কাজলের মৃত্যুর একটা আনুমানিক তারিখ ধরে পঞ্চাননতলায়

পুজো দেয় বছর বছর, বিশেষে কারুর সঙ্গে মেশে না। নেহাৎ প্রাণকেষ্টটা নাছোড়বান্দা তাই ওকে এড়াতে পারেনা।

* * *

রগের শির দুটো টিপে ধরে থাকার দরুণই বোধ হয় দপদপ করে উঠল।

উঠে ঘরে গিয়ে ট্রাঙ্কের নীচের খাঁজ থেকে একখানা চকচকে ছোরা বার করল বংশী। তার কারখানা থেকে পালিশ করিয়ে আনা।

হিংস্র চোখে সেইটার দিকে তাকিয়ে থাকল বংশী কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ নিজের মাথার তাকিয়াটার ওপর সজোরে বসিয়ে দিল।

ঠিক খুনীর মতই দেখতে লাগল বংশীকে।

তুলোর খাঁজ থেকে বার করে বিছানার চাদরের কোন দিয়ে মুছে নিয়ে আর একবার সন্তর্পণে ধারটা পরীক্ষা করে নিল! সাংঘাতিক ধার।

একবারের বেশী দু'বার বিঁধতে হবে না।

আমূল ঢুকে যাবে।

এক সময় হঠাৎ এই শহরতলীর আশে পাশে কিছু গুণ্ডা জাতীয় দুর্বৃত্তের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, ঘরে ঘরে সবাই তখন আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবে ছোরাছুরি, দা, কুড়ুল, বল্লম, লাঠি, সড়কি থেকে শুরু করে বঁটি, কাটারী, থান ইঁট, লঙ্কার গুঁড়ো পর্যন্ত হাতের কাছে মজুত রাখার অভ্যাস করেছিল।

এই ছোরা তখনকার।

তাই বংশী স্টেশনে না গিয়ে ঘোষের পুকুরে গিয়েছিল।

কাজল দেখে বলেছিল, 'বাবাঃ দেখে বুক কাঁপছে।'

বংশী ওখানকার ধার পরীক্ষা করতে করতে বীরত্বব্যঞ্জক হাসি হেসেছিল।

'বাড়িতে ও জিনিস রাখছ বটে—' কাজল দুষ্টু হাসি হেসে বলেছিল, 'কথায় বলে মন না মতি। ধরো যদি রাগের মাথায় বুকে বসিয়ে ফেলি।'

'কার বুকে ?'

বংশী হেসে উঠেছিল।

হাসি তামাশাও ছিল বৈকি তাদের জীবনে···কতো ছিল। বংশীর মেজাজটা গোঁয়ার গেছের বলেই যা মাঝে মাঝেই তালভঙ্গ হতো।

তাছাড়া কাজল ও যে একটা সৃষ্টিছাড়া বেয়াড়া। ইহ সংসারে কাজলের মতো উল্টোপাল্টা মেয়ে দেখতে পাবেনা কেউ।

কাজল অনায়াসে বলে বসেছিল, 'ধর তোমারই বুকে।' হেসে উঠেই অবশ্য।

তা' হলেও হিন্দুর মেয়ে হয়ে একথা বলতে মুখে আটকায়নি তার।

বংশী চমকে উঠেছিল।

তারপর বলেছিল, 'ভালই তো! তোমার সুবিধে করে রাখলাম।'

এবারও কাজল অম্লান মুখে বলেছিল, 'আসলে যে কার সুবিধের জন্যে সেটা ভবিষ্যতে বোঝা যাবে।'

কাজল কি ভবিষ্যৎটা দেখতে পেয়েছিল ?

তাই কাজল একটা নিশ্চিত সুরের কথা বলে উঠেছিল ?

বংশী বসতে পারছিল না, দাঁড়াতেও না, তাই পায়চারী করে পাক খাচ্ছিল।

এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ঝোপঝাড় গাছপালাগুলো অন্ধকারের ড্যালার মতো জায়গায় জায়গায় স্থির হয়ে আছে।

বাতাস নেই, গাছপালা নিথর।

এই দণ্ডে বেরিয়ে পড়বে বংশী ?

কিন্তু এখন গিয়ে কী লাভ ?

এখন তো গাড়ি নেই।

হঠাৎ চড়াৎ করে একটা কথা মাথায় এল বংশীর। যা এযাবৎ একবারের জন্যও মনে আসেনি।

কাজল তাহলে স্টেশনে গিয়েই লুকিয়ে বসেছিল। ভোরের গাড়ি ছাড়তেই—

বংশী যদি পুকুরে খুঁজতে না গিয়ে স্টেশনে খুঁজতে যেতো।

বংশী তার বৌকে বড় বেশী বিশ্বাস করেছিল।

বংশীর সেই মূঢ় বিশ্বাসের ত্রুটি খণ্ডন করবে আজ বংশী।

ছুরিটা আস্তে আবার ট্রাঙ্কের মধ্যে তুলে রাখল বংশী। ত্রিজগতের কাউকে দেখাবে না জিনিসটা, স্রেফ্ তার জন্যে, একান্তই তার জন্য, স্রেফ্ তার জন্য উপহার নিয়ে যাবে।

ট্রাঙ্কের তালাটা সাবধানে বন্ধ করে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। প্রাণকেষ্ট নির্ঘাৎ আবার আসবে।

* * *

প্রাণকেষ্ট যখন বিয়ে করেছিল, মনে মনে সংকল্প করেছিল নেহাৎই যখন ভাত রাঁধার জন্যে বিয়ে করা, তখন বৌকে ঠিক সেই পজিশানেই রাখবে। বংশীদার মতন ভালবেসে ফেলে জানে প্রাণে মরবে না। তুমি রাঁধবে বাড়বে কাজকর্ম করবে, আমি তোমায় খেতে পরতে দেব, ইচ্ছে মতন দুদিন সিনেমা দেখাবো, ব্যস্!

আর কোনো সম্পর্ক নয়।

মেয়েমানুষ জাতটি যে কেমন তা তো জানা হয়ে গেছে প্রাণকেষ্টর।

কিন্তু বিয়ের পর ওই সংকল্পটি বর্ষার শেষের ব্যাঙের ছাতার মত মিলিয়ে গেল।

'বৌয়ের কাছে প্রাণ ঢেলে বসবো না' এই প্রতিজ্ঞাটা নিতান্তই হাস্যকর বলে মনে হয়েছে তার। অতএব প্রাণ ঢেলেছে।

যদিও মাঝে মধ্যেই শোনায়, 'মেয়েছেলে জাতটাকে বিশ্বাস নেই।'

ইন্দুও ছেড়ে কথা কয় না।

বলে, 'সব মেয়েছেলেই এক মশলায় তৈরী নয়। তোমার মাও মেয়েছেলে ছিলেন।'

আর কী জবাব ?

সে যাক্—বৌয়ের কাছে প্রাণ ঢালবো না প্রতিজ্ঞাটা যখন নেই তখন আর প্রাণকেষ্ট বৌয়ের কাছে ওর এই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার খবর না দিয়ে পারল না। 'বংশীদাকেও জানিয়ে এলাম।' শব্দটিও বলতে ছাড়ল না।

ইন্দু প্রাণকেষ্টর থেকে কম-সে-কম আট দশ বছরের ছোট, তবু ইন্দু শুনেই গালে হাত দিয়ে বলল, 'সববো—না-শ! ইতি-মধ্যেই বংশী দাদাকে বলে আসা হয়ে গেছে?'

'সববোনাশ?' প্রাণকেষ্ট কপাল কুঁচকে বলে, 'সববোনাশ মানে? যার জিনিস যার ব্যাপার তাকে বলব না? কাল রাত থেকে কী ভাবে যে ঘণ্টা মিনিটগুলো কেটেছে আমার! মাসি কতো বলল, 'এলিই যখন বাড়ির বৌভাতের ভোজটা খেয়ে যা—' আমি বললাম কাজ আছে থাকা চলবে না। দেখে অবধি পেটের মধ্যে পাক খাচ্ছিল আমার, কতক্ষণে বংশীদার কাছে গিয়ে পড়ব।'

—ইন্দুর বিয়েটা অবশ্য মাত্র দু বছর হয়েছে। কিন্তু বয়েসটা বসে ছিলনা ওর, তাছাড়া স্বভাব গুণে বেশ পেকে টেকে ঝুনোও হয়ে গেছে সে। তাই তেইশ বছরের ইন্দু তার তিরিশ বছরের বরকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলে—

'কতক্ষণে বংশীদার কাছে গিয়ে পড়ব! বুদ্ধির বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছে করে। শুনে বংশীদার মাথায় খুন চেপে যাবে এটা মনে এলো না?'

'খুন চেপে যাবে?'

প্রাণকেষ্ট আকাশ থেকে পড়ে।

'আহা আকাশ থেকে পড়লেন! ঝিনুকে দুধ খাওয়া খোকা! খুন চাপবে না! বলি, শুনে মাত্তর কী বলল বংশীদা?'

'বলল? বলল, কেষ্ট শীগগির সেখানে নিয়ে চল আমায়।'

'কেমন ভাবে বলল? বেশ ভাল মুখে?''

প্রাণকেষ্ট এবার আমতা আমতা করে বলে, 'মানে মুখ কি আর ভাল থাকে? হঠাৎ আচমকা ওরকম খবরে—তা' আমি বললাম আমি যদি আবার এক্ষুনি আজই ও গাঁয়ে গিয়ে পড়ি, লোকের সন্দ হবে না? দু-চারদিন পরে বরং—'

প্রাণকেষ্ট গলা ঝেড়ে ঢোক গিলে বলে, 'সেকথা শুনে অবিশ্যি রেগে উঠল। বলল, 'কেষ্ট, তুই আমার জায়গায় নিজেকে বসা, তারপর কথাটা বল।'

'তারপর ?'

'তারপর ?' প্রাণকেষ্ট মাথা চুলকে বলে, 'তারপর হল কিছু কথা। শেষ অবধি বলল, না আমি একলাই যাব, তুই ঠিকানাটা দে।'

প্রাণকেষ্ট একটু হাসির মত করে বলে, 'বলে না তক্ষুনি উঠে গায়ে জামা চড়াচ্ছে। বলে এক্ষুনি যাবো।' আমি তো থ। বলি—এক্ষুনি যাবে কী গো ? এখন গাড়ি কোথায় ? বলে কিনা 'পায়ে হেঁটে যাব।' ধরে রাখা যায় না। বাই চাপা মানুষের মতন ছটফট করে জামা ছাড়ে তো জুতো পরে, জুতো ছাড়ে তো জামা পরে। অনেক বলে কয়ে রেল গাড়ি ছাড়া যাওয়া যাবে না বলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিবৃত্তি করে এলাম।'

'নিবিত্তি করে এলে ?'

ইন্দু কাছে সরে এল।

'শেষ অবধি চিরকালের জন্যে তুমি নিবিত্তি করতে পারবে ?'

'বাঃ তাই বা করতে যাব কেন ? এই দণ্ডে যাবে—বলেছে তাই নিষেধ', প্রাণকেষ্ট বলে 'এতদিন ধরে যে মানুষটাকে মরে গেছে বলে খরচের খাতায় রেখে দিয়েছিল, সে বেঁচে আছে জেনে একবার দেখতে যাবে না ?'

'দেখতে যাবে ?'

ইন্দু ফিসফিস করে বলে, 'শুধু দেখে আসবে ? এরকম ক্ষেত্রে পুরুষের রাগ চণ্ডালের অধিক হয় তা জান না ? গিয়ে যদি খুন করে ?

প্রাণকেষ্ট লাফিয়ে ওঠে।

'কী ?'

'কী আবার, যা সম্ভব তাই বলছি। বংশীদা সেখানে গিয়ে নিঘ্‌ঘাত খুন করে আসবে তোমার কাজল বৌদিকে ! আশ্চর্য্য, তুমি সাত্‌তাড়াতাড়ি ওনাকে বলতে গেলে কেন ? ঘরে এসে পরামর্শ করে বুঝে সুঝে বলতে।'

প্রাণকেষ্ট হঠাৎ ঠাই ঠাই করে নিজের গালে চড় মেরে বলে, 'ইন্দু, আমি কী মুখ্যু, কি মুখ্যু ! এখন কী হবে ?'

'কী হবে তাই ভাবছি।'

ইন্দু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'তুমি এক কাজ কর, ভুল ঠিকানা দাও, খুঁজে না পেয়ে ফিরে আসবে বংশীদা।'

প্রাণকষ্টের প্রাণটা নিভে যায়।

সে গুড়েও বালি।

ঠিকানা দেবার বাকি নেই।

প্রাণকেষ্ট অপরাধী গলায় বলে, 'সে ও তো এক কীর্তি করে বসে আছি।'

'কী আবার কীর্তি করলে? তোমরা বেটাছেলেরা ওই করতেই আছ।'

'আর তোমরা – মাঝের মাছখানি!'

'আমাদের মতন বুদ্ধি হলে তরে যেতে গো! বলি কীর্তিটা কী করলে?'

'ঠিকানা বোঝাতে নেমন্তন্নর চিঠিখানাই পকেটে থেকে বার করে দিয়ে এসেছি।'

'নেমন্তন্নর চিঠি!'

'আহা বলাইয়ের বিয়ের নেমন্তন্নর চিঠি ছিল না? পকেটেই ছিল সেটা। তাতে তো নিখুঁত করে জেলা পাড়া পোস্টঅফিস সব লেখা ছিল!'

'তা ভালো! দেখোগে এখন অবস্থা।' ইন্দু বলে 'ভগবান জানে মনমরা অবস্থা কী খুনচাপা অবস্থা।'

'বংশীদা কাজল বৌদিকে প্রাণের অধিক ভালোবাসত!'

'তাহলে তো আরোই। দেখোগে হয়তো ছুরি শানাচ্ছে।'

ইন্দু অবিশ্যি এসব ঠাট্টা করেই বলেছে, ঘটনা যে সত্যিই তাই ঘটেছে তা আদৌ ভাবেনি।

প্রাণকেষ্ট গিয়ে থমকে গেল।

পুরো খুনীর মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বংশী।

উনুনটা মার খেয়ে মরে পড়ে থাকা কুকুর বেড়ালের মত পড়ে আছে, কারণ বংশীর পায়চারীর সময় একবার পায়ের ঠোক্কর খেয়েছিল উনুনটা।

সামনে কটা রুটি শুকনো হাড় হয়ে ছাই মাখা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অতএব বংশী খায়নি।

প্রাণকেষ্ট নিজের অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে পারে।

প্রাণকেষ্ট ভয়ে ভয়ে ডাকে 'বংশীদা!'

বংশী সাড়া দেয় না, যেমন উঠোনে পাক খাচ্ছিল তেমনি পাক খেতে থাকে।

প্রাণকেষ্ট আবার ডাকে।

বংশী দাঁড়িয়ে পড়ে লাল চোখ তুলে তাকায়।

প্রাণকেষ্ট গলা ঝেড়ে বলে, 'বৌ রান্না করেছে, আমায় পাঠিয়ে দিলে তোমায় ডেকে নিয়ে যেতে।' বানিয়েই বলল অবশ্য।

বংশী হঠাৎ একটা ধিক্কারের সুরে বলে, 'হুঁঃ।' মায়াবিনী যাদুকরীরা অমনি মায়া দেখায়। ওসবের মধ্যে আমি আর নেই কেষ্ট।

'বংশীদা, তাহলে তো আমাদেরও খাওয়া হয় না।'

'কেন? কেন? তোমাদের হয় না কেন?' বংশী ক্ষেপে উঠে বলে, 'আমাকে একটু একলা থাকতে দে কেষ্ট। বাড়ি যা।'

'যা হোক কিছু মুখে দিয়ে একলা থাকো বাবা—'

'দোহাই কেষ্ট! তোর পায়ে ধরি আমি খেতে পারবনা পারবনা পারবনা। তুই যা।'

কিন্তু কেষ্ট যায় কী করে?

ইন্দু তার মনে যা ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে।

মরতে সে বংশীদার কাছে ওকথা তুলতে গেছল। কী লাভ হল এতে? কাজল বৌদি মরে গেছে ভেবে বংশীদা একটা পবিত্র শান্তির মধ্যে বাস করছিল। সে শান্তিটুকু ঘুচিয়ে দিল প্রাণকেষ্ট।

কিন্তু করতে তো কিছু হবে।

'আমি বলছিলাম কি বংশীদা, গিয়ে আর কী হবে?'

'কেষ্ট, তুই এই রাতেই আমায় বাড়ি ছাড়া করতে চাস?'

তারপর হঠাৎ উৎকট একটা হাসি হেসে বলে ওঠে বংশী,

'যাবনা কী বল ? মরা মানুষ কেমন করে ছড়া বাঁধে, গান গায়, বাসরে নাচে, দেখতে যাবনা ? এটা একটা দ্রষ্টব্য নয় ?'

বংশীদা আমি তোমার সঙ্গে যাব।

'কেষ্ট খবরদার !'

প্রাণকেষ্ট অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে থেকে নিজের গালে মুখে চড়াতে চড়াতে চলে গেল।

বাড়ি গিয়ে বলল, 'বলা বৃথা। খেতে চাইল না। রুটি গড়া ছিল, আগুন নিভিয়ে উনুন ফেলে দিয়েছে। সত্যি খেতে পারা শক্ত। এই আমারই মনে হচ্ছে গলা দিয়ে ভাত নামবে না। যে মন নিয়ে ছুটে এসেছি।'

ইন্দু মুখ টিপে হেসে বলে, 'কাজল বৌদির ওপর তোমার ও তো দেখছি ষোলো আনা টান।'

'তা মিথ্যে বলনি', প্রাণকেষ্ট অন্যমনা ভাবে বলে, 'মানুষটার ক্ষ্যামতা ছিল মন টানবার। সে এক অন্য ধরনের মানুষ, বুঝলে মেয়েছেলে হয়ে বলত 'সাধ হয় একটা যাত্রাপার্টি খুলি। নচেৎ একটা কেত্তনের দল।'···বলত 'জগৎ সুদ্ধ সব মেয়ে ভাত রাঁধবে আর ঘরে বন্দী হয়ে বসে থাকবে, ভগবান একথা তাদের কপালে লিখে পাঠিয়েছে ? বলত আরো অনেক কথা।'

ইন্দু চোখ নাচিয়ে বলে, 'তোমার সঙ্গেই বুঝি মনের প্রাণের কথা হত ?'

'ছোটলোকের মতো বল না—' প্রাণকেষ্ট কড়া গলায় বলে, 'যা বলত বংশীদার উপস্থিতিতে। বলত—'সাধ হয় একটা ভালবাসার মানুষকে নিয়ে পথে পথে গান গেয়ে বেড়াই।'

'ও বাবা ! এ যে নাটক নভেলের কথা।'

'কিসের কথা তা' জানি না। আবার এও বলত, 'ইচ্ছে হয় যে মা যশোদার মতন একটা গোপাল নিয়ে হিমসিম খাই আর ননী-চোরার গান গাই !' ··গান গান, গানেই পাগল। 'আর ওই গান নিয়েই বংশীদার সঙ্গে যতো খিটিমিটি।'

'উনি বুঝি গান ভালবাসেন না ?'

'আহা তা' বাসবেনা কেন ? বলে কেত্তন শুনতে চারমাইল

পথ হেঁটে 'ছোট নন্দীপুরে' ছোটে। ওখানে ঠাকুর বাড়ি আছে না? রাসে দোলে ঝুলনে গান কেত্তন হয়।...কিন্তু ঘরের বৌ গলা ছেড়ে গান গাইছে, এটা দেখতে কার ভাল লাগে বল?'

'ঘরের বৌরা যখন গলা ছেড়ে শহর ফাটিয়ে কোঁদল করে।'

'ওমা এ যে দেখি সব শেয়ালের এক রা।' প্রাণকেষ্ট বলে, 'তুমিও যে কাজল বৌদির মতন বললে। বৌদি তো ঠিক ওই কথা নিয়ে তক্কো করতো। কথার খুব ধার ছিল।'

ইন্দু একটু চুপ করে থেকে বলে, 'এই, তোমার কি মনে হয় বলত?'

'কিসের কী?'

'ওই তোমার কাজল বৌদি সত্যিই মরতে গিয়ে মরতে ভয় পেয়ে পালল, না কি পালাবো মতলব করেই মিথ্যে রটনা দিয়ে ধাঁধায় ফেলে রেখে গেল, যাতে আর কেউ না খোঁজে।'

'কী করে জানব বল?'

'আমার মনে হয় শেষেরটাই ঠিক।'

প্রাণকেষ্ট ঝেঁজে উঠে বলে, 'আচ্ছা তোমাকে আর খড়ি পাততে হবে না। এখন পিণ্ডি গেলাটা সেরে নেওয়া হোক।'

'ওঃ।'

ইন্দু তীব্র হয় তীক্ষ্ম হয়, 'কী মেজাজ বাবুর। কাজল বৌদির নাম করবার জো নেই। যা বুঝছি একটা মেয়ে মানুষ দুটো পুরুষের মুণ্ডু ঘুরিয়ে রেখেছিল। নেহাৎ কলা দেখিয়ে চলে গেল, তাই বুড়ো বয়সে বে করা!'

'ইন্দু ভালো হবে না বলছি—'

'কি? তোমারও খুন চাপছে? তা হলেই বুঝছ?'

প্রাণকেষ্ট হতাশ ভাবে বলে, 'বুঝেছি! তুমি তো না বুঝিয়ে ছাড়ছনা।'

'যা বলছি ঠিক। বংশীদা কী করবে বলা যায় না। কিন্তু কাজল বৌদি যদি খুন হয় তো জেনো তোমার দোষেই হল।'

হঠাৎ প্রাণকেষ্ট বিরাট একটা ধমক দিয়ে ওঠে, 'অনবরত

অলক্ষ্মণে কাল পেঁচার ডাক ডেকেই চলেছ। আচ্ছা এক ইয়ে মেয়ে মানুষ তো! চুপ কর বলছি।'

ইন্দু এবার ভয় পেয়ে চুপ করে যায়।

সত্যি বলতে কথাগুলো ইন্দু লীলাছলেই বলছিল। সত্যিই যে বংশী শুধু একটু ঠিকানার জোরে কোথায় কোন অজ গাঁয়ে লুকিয়ে থাকা মানুষটাকে খুঁজে বার করে টেনে এনে খুন করবে, এমন বিশ্বাস নেই তার। তবে এরকম ক্ষেত্রে কী হতে পারে না পারে সেটা সে জানে। এইটাই জানাচ্ছিল প্রাণকেষ্টকে।

এখন প্রাণকেষ্টর উগ্রচণ্ড মূর্ত্তি দেখে ভয় পেয়ে গেল।

কিন্তু প্রাণকেষ্টর প্রাণে সন্দেহের আর আতঙ্কের বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে বসেছে ইন্দু। প্রাণকেষ্ট মনশ্চক্ষে দেখতে থাকে এরপর বংশীকে খুনের দায়ে ফাঁসি যেতে হবে।

হায় ভগবান, প্রাণকেষ্ট কেন মাসতুতো ভাইয়ের বিয়েতে ওইখানেই গেল। প্রাণকেষ্ট কেন একটা মরা মানুষকে রূপের ছটায় আর রসের ঘটায় বিকীর্ণ হতে দেখল।

প্রাণকেষ্ট কেন তৎক্ষণাৎ বংশী নামের গোঁয়ার লোকটাকে সেই খবরটা দিতে বসল।

—তা লোকটা যে গোঁয়ার তা'তে তার সন্দেহ কী? নইলে চিরদিনের অনুগত বন্ধু কেষ্টর মুখের সামনে ছুরি তোলে?

কেষ্ট সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখে চোঁ চোঁ দৌড় দিয়ে বাঁড়ি ফিরে দরাম করে দোর বন্ধ করে হাঁপাতে থাকে।

উঃ! ইন্দুর কাল পেঁচার ডাকই ফলবে। কাজল বৌদি খুন হবে, বংশীদা ফাঁসিতে ঝুলবে।

আর নিজেকে তার কারণ ভেবে জীবন ভোর নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে প্রাণকেষ্ট।

খাওয়া দাওয়ার পর আবার গিয়েছিল প্রাণকেষ্ট দুখানা রুটি তরকারি হাতে করে।

'বংশীদা, ভোরের বেলা যদি বেরোতেই হয়, একেবারে উপোসী থাকা ঠিক নয় দু'খানা মুখে দিয়ে নাও।'

বংশী কোন কথা না বলে, হাত বাড়িয়ে কাগজে মোড়া রুটি

আর আলুচচ্চাড়িটা নিয়ে ছুঁড়ে টিউবওয়েলের গোড়ায় ফেলে দিয়েছিল।

এই উম্মাদ মূর্ত্তি দেখে ভয়ে প্রাণ উড়ে যায় প্রাণকেষ্টর, সে হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে বলে ওঠে, 'আমি তোমার সঙ্গে তামাসা করেছি বংশীদা, আমি কাজল বৌদিকে দেখিনি। আমি মজা করতে মিছে কথা বলেছি—'

একথা শুনেই বংশী হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। আর পরক্ষণেই একখানা ঝকঝকে ছোরা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে ভয়াবহ গলায় বলে উঠল, 'জিনিসটা দেখতে পাচ্ছিস ? চিনিস ?'

চেনেনা আবার।

প্রাণকেষ্টইতো ওটায় শান দিইয়ে ডবল ধার করিয়ে নিয়ে এসেছিল।

কিন্তু সেটা এখনো ছিল !

কবেকার কথা সেটা !

ছোরাটা দেখেই প্রাণকেষ্ট উল্টোপাক খেয়ে ছুট দিয়েছিল।

আর ভোরবেলা ইষ্টিশানে গিয়ে সঙ্গ নেবার চেষ্টা করেনি।

ইন্দু ওটা জানত না। ইন্দু শেষ রাতে ডেকেছে, 'কি গো যাবে নাকি ইষ্টিশানে ?'

প্রাণকেষ্ট গভীর ঘুমের ভান করে জড়িয়ে জড়িয়ে বলেছে, 'না ! আজ হপ্তার দিন।'

যেন বংশীর শুভাশুভর চাইতে তার হপ্তার দিনটা বেশী জরুরী।

ইন্দু একটু আশ্চর্য হলেও স্বস্তিও পেয়েছিল।

কোন মেয়েমানুষটা আর এমন পরিস্থিতিতে স্বামীকে এত অনিশ্চিত ভয়াবহতার মধ্যে ঠেলে পাঠাতে চায় ?

অতএব প্রাণকেষ্টর ঘুমের ভানের মধ্যে তীক্ষ্ম বাঁশী বাজিয়ে রেলগাড়ী বেরিয়ে গেল !

শহরতলীর এই ছোট লাইন থেকে বড়ো লাইনে গিয়ে পেঁছুতে হবে। সেখান থেকে মেন লাইনের ফ্যাঁকড়া লাইন ধরে তবে সেই 'ক্যাওট্ গোবিন্দপুর।'

ঘরকুনো বংশী এত ঝঞ্ঝাটের আশঙ্কা নিয়েও ঘর ছাড়ল !

বংশীর হাতে কিছু নেই শুধু কাঁধে একটা ঝোলা। ওই মলিন ঝোলার মধ্যেই সেই চকচকে ঝকঝকে পালিশ করা বস্তুটা !

বংশী যখন 'ক্যাওট্ গোবিন্দপুর' স্টেশনে নামলো, তখন রাত আটটা সাড়ে আটটা। এটাই এখানকার লাস্ট ট্রেন। অথবা একমাত্র ট্রেন। আগে না কি সকালের দিকে একটা গাড়ি ছিল. সম্প্রতি রেল কোম্পানী সেটা তুলে দিয়েছে।

বংশী দেখল স্টেশন ছাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই যেন অন্ধকারের দেয়াল। রাস্তায় চোখ চলেনা। হঠাৎ হঠাৎ ওই অন্ধকারের দেয়ালে খানিকটা চাপড়া চাপড়া অন্ধকার। তার মানে গাছের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে।

এইখানে এসে বাসা বেঁধেছে কাজল নামের সেই বিদ্যুৎ হানা মেয়েটা। কিসের লোভে ? কোন মদে মজে ?

বংশীর সহসাই মনে পড়ল কাজল পাড়া গাঁ ভালবাসত। বংশীদের ওই শহরতলীর আধা শহর আধা মফস্বল জায়গাটাকে ধিক্কার দিয়ে বলত, 'অজ পাড়া গাঁ বলে নাক ছেঁচকাও তোমরা, আমার মনে হয় ওর তুল্য জায়গা নেই।'

বংশী ক্ষ্যাপাত, 'সত্যি ! কেমন পানা পুকুর, আশ শ্যাওড়ার বন, পচা ডোবা, মশা. মাছি, ঘেয়ো কুকুর. মড়াখেগো গরু—'

কাজল কিন্তু ক্ষেপত না।

কাজল ওর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলত, 'তা আছে। আবার তার দঙ্গে আছে শিউলী কনকচাঁপা গন্ধরাজ গুলঞ্চ !···ভাল মন্দয় মিশোনো জগৎ।'

বংশীর উদভ্রান্ত মাথাতেও শিউলীর গন্ধ নাকে এল।

আশে পাশে কোথাও ফুটেছে।

বেশ খানিকক্ষণ হাঁটার পর একটা দোকানের আলো দেখতে পেল বংশী। বংশী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল পাছে ঝাঁপ বন্ধ করে ফেলে।

তা ফেলছিলই।

মুড়ি বাতাসা বাদাম ছোলা ভিজের দোকান।

বংশী বলল, 'একটু বসতে পারি?'

দোকানী তাড়াতাড়ি ঝাঁপের আধখানা নামিয়ে সাবধানে বাকিটায় হাত চেপে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী চান?'

'আপাততঃ একটু বসতে চাই।'

দোকানীর গরজ দেখা গেল না বংশীর চাহিদা সম্পর্কে! গম্ভীর ভাব অবলম্বন করে বলল, 'আপনাকে তো কখনো এদিকে দেখিনি।'

'না আমি নতুন লোক। আসিনি কখনো এদিকে, একটা খবর পেয়ে এসেছি।'

দোকানী ভয় খায়।

দিনকাল তো ভাল নয়। এই অজ পল্লীগ্রামেও পার্টির ছেলে টেলে লুকিয়ে থাকতে আসে টাসে, পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছিল একবার।

দোকানী সন্দেহ গলায় বলে, 'কিসের খবর?'

'কোন এক রায়চৌধুরীরা নাকি কিছু ধেনো জমি বেচবেন—' হ্যাঁ এইটাই ভেবে ঠিক করল বংশী।

দোকানী নিঃশ্বাস ফেলে।

স্বস্তির।

তবু ভাল। রক্ষে পাই।

এখন ঝাঁপটা একটু ঠেলে একখানা ভাঙা নড়বড়ে টুল দিয়ে, 'বসুন বসুন! খপর কাগজে খপর পেয়েছেন বুঝি? রায়চৌধুরীদের তো এখন ওই কর্মই সার হয়েছে। সেই যে কথায় বলে না, 'এক পুরুষে গোলা বাঁধে দ্বিতীয় পুরুষে পায়, আর তিন পুরুষে ভাঙা গোলার বেচা কড়ি খায়।'...তা এখন ওই রায়চৌধুরীদের তিনপুরুষের গুণ ধরেছে। যেখানে যত জমি ছিল, ভালো ভালো জমি, ধেনো জমি উঁচু জমি, সব বেচছে আর খাচ্ছে। অথচ ঠাট বাটটি আছে। এই তো সেদিন মেয়ের বিয়ের এতো ঘটা। ওই জমি বেচার টাকায়। তা' আপনি বুঝি ধান জমি কিনবেন?'

'সেই তো ইচ্ছে?'

বংশী খরখরে গলা করে শক্ত করে বলে, 'তা ওরা লোক কেমন ? ঠকাবে টকাবে না তো ?'

দোকানী লম্বা করে জিভ কেটে বলে, 'না না, সে সব কোন দোষ নেই। ভিন গাঁয়ের লোক এসে জমিগুলো কিনছে, এটাই যা দুঃখু। তা আপনি এইবেলা ওনাদের সঙ্গে দেখা করতে চান ? রাত হয়ে গেছে। অসুবিধের ট্রেন, রাত ভিং আবার জো নেই। রেল কোম্পানীর মর্জি, বলা কওয়া নেই, সকালের গাড়িটা তুলে দিল। এখন এই আঁধার পথ, বিদেশী মানুষ—।'

এসব কথা বংশীর মাথায় ঢুকছিল না।

বংশীর শুধু মনে হচ্ছিল সেই বাড়িটায় গিয়ে পড়লেই বুঝি সামনেই সেই কাল নাগিনী শয়তানীকে দেখতে পাবে, আর বংশী সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বলবে 'মানুষ খুন করায় পাপ আছে, ভুত খুন করায় তো নেই। চার বছর ভুত হয়ে নরকে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, আয় আজ তোকে স্বর্গে পাঠাই।'

'আমার হাতে সময় কম, আজই দেখা হলে ভাল হতো।'

'তা সে আপনার মর্জি।'

বলে দোকানী হাতের হ্যারিকেন লণ্ঠনটার পলতে ঈষৎ বাড়ায়।

'বাড়িটা কোন দিকে বলতে পারেন ?'

'ওই তো ওই দিকে। তা এই কেষ্ট পক্ষে না এলেই পারতেন আপনি। সঙ্গে টর্চ বাতি আছে ?'

'না।'

'এই দেখুন এমন আবোড়ের কাজ করে ? টর্চ বাতি একটা সঙ্গে না নিয়ে এই রাতের গাড়িতে এসেছেন আপনি ? তাও তো মনে হচ্ছে এদিকে আসেননি কখনো।'

'না আসিনি।'

দোকানী অবশ্য ধানজমির ক্রেতা লোকটাকে চাষীভূষোই ভাবে।

তাই বলে, 'আপনার বরং রাতটা এ ষ্টেশনের চালায় কাটিয়ে দিলেই ভাল হত। সকালের আলোয় যা করবার করতেন।'

বংশী ব্যগ্রভাবে বলে, 'আপনার দোকানে রাতটার জন্যে একটু জায়গা হয় না ?'

'না না। সে সুবিধে হবে না।

বলেই চটপট হ্যারিকেন দোলাতে দোলাতে কোন এক অন্ধকারের বাঁকে মিলিয়ে যায় লোকটা।

বংশী বোঝে ওর উপদেশটা ফেলনা নয়।

বংশী আস্তে আস্তে উল্টো দিকে ঘোরে।

অনেকক্ষণ ভিতরের যন্ত্রণার দংশনের আর বাইরের মশার দংশনের জ্বালায় ছটফটিয়ে জেগে থেকে শেষ রাত্রের দিকে একটু ঢুলুনি এসেছিল, ঢুলুনি ভাঙতে দেখলো ফর্সা হয়েছে।

টিনের শেড্ দেওয়া ষ্টেশন এখন খা খা করছে। এখন কোনো গাড়ি নেই।

বংশী উঠলো, ঝোলাটা সামলে আস্তে আস্তে গ্রামের ভিতরের পথ করল। রাতে যা শুধু একটা চাপচাপ অন্ধকারের দেওয়ালের মতো লাগছিলো, এখন তা একটি শ্যামল শোভা নিয়ে পরিস্ফুট।

কিন্তু রাস্তায় লোক কোথায় ?

কাকে জিগ্যেস করবে বংশী রায়চৌধুরীদের বাড়িটা কোন দিকে ?'

বেলা হয়ে উঠছে, বংশী আর একটু এদিক ওদিক যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায়। একটা ভাঙা পাঁচীলের ধারে শিউলীর চাদর বিছানো। সেখানে কলরব করে, কটা ছেলে মেয়ে ফুল কুড়োচ্ছে।

বংশী কাছে যেতেই ওরা আড়ষ্ট হয়ে সরে দাঁড়াল।

বংশীর চেহারা আপাততঃ ভয়াবহ।

বংশীর চুলগুলো রুক্ষ এলোমেলো, মুখটা শুকনো কঠিন, চোখ দুটো লাল টকটকে।

বংশী সেটা টের পেল না।

ও আবার এগিয়ে গিয়ে বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করল 'এখানে রায়চৌধুরীদের বাড়িটা কোন দিকে জান ?'

ছেলে মেয়ে দুটো চোখে চোখে কী যেন ইসারা করল, তারপর

একটা ছেলে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ কোনো একদিকে একটা আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'উইদিকে।'

'আমায় একটু চিনিয়ে দিতে পার?'

একটা মেয়ে আর একটা মেয়েকে ঠেলা মেরে ফিসফিসিয়ে কী বলল।

বংশী সাহসে ভর করে বলল, 'আমি কিছু জমি কিনবো, তাই—'

'ওঃ।'

একটা মেয়ে বলল, 'এই রাজু তবে তোর দাদুর কাছে নিয়ে যা—'

বংশী হঠাৎ সেই ভাঙা পাঁচীলের ইঁটের গাদায় বসে পড়ল।

ঝড়ের সমুদ্র প্রাণপণে ঠেলে পার হয়ে কূলে এসে ঠেকলে মাঝি যেমন একবার দাঁড়টা শিথিল করে নিশ্বাস নেয়, তেমনি একটা নিশ্বাস নিল বংশী।

'ওমা আপনি বসে পড়লেন কেন?'

'এই একটু জিরিয়ে নিচ্ছি।'

এবার ওদের সাহস হয়, সেই রাজু নামের মেয়েটা বলে, 'কোথা থেকে আসছেন?'

বংশী আস্তে আস্তে বলে 'কলকাতা থেকে?'

'ওমা! এখন কোন গাড়ি?'

'রাত্তিরে এসে ইষ্টিশনে ছিলাম।'

'এ মা? তাহলে তো রাত্তিরে খাওয়াই হয়নি।' মেয়েটা বলে, 'চলুন।'

'যাচ্ছি! আচ্ছা খুকী বলতে পারো এখানে কোনো কীর্ত্তনী থাকে কি?'

'কীর্ত্তনী? কীর্ত্তনী কি?'

'মানে গান টান গায়, কীর্ত্তন গান। বেশীদিন আসেনি এ গাঁয়ে, এই মানে তিন চার বছর—'

'ও স্বপন পালাগানের স্বপন দাসের কথা বলছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। তার বাড়িতে একজন মেয়েছেলে আছে, ভাল গান গায়।'

'বুঝেছি বুঝেছি! ওনার বৌ সুধা বৌদি! আপনার চেনা বুঝি?'

'হুঁ! বাড়িটা আমায়—'

রাজু বলে, 'আমাদের বাড়ি যাবেন না?'

'যাব। মানে চেনা বাড়িটা পেলে আগে সেখানেই—'

প্রথমে ছেলেটা কয়েক পা এগিয়েই বলে, 'এই ডান দিক দিয়ে চলে যান, একটা বড় বটগাছ আছে, তার ওধারে—সে আপনি একটু গেলেই চিনতে পারবেন। সকাল থেকে তো গান হয়। ঠাকুরআছে—'

কর্তব্য শেষ করে ছেলেটা আবার ফিরে আসে।

এই ঝামেলায় পড়ে তার ফুলের ভাগ কম হয়ে গেল! কী জ্বালা!

হ্যাঁ ঠিক বলেছে ছেলেটা।

দূর থেকে গান শোনা যাচ্ছে।

কীর্ত্তনের সুর।

কোনো কোনোদিন কারখানা থেকে আসতে আসতে এই সুর শুনতে পেত বংশী।

বংশীর কান জুড়িয়ে যেত, কিন্তু প্রাণ জুড়িয়ে যেত না। বংশী বাকি রাস্তাটা প্রায় উড়ে চলে আসত আর বলত, 'গলাটা একটু নাবিয়ে গাইলে হয় না?'

কাজল নামের বাচাল মেয়েটা হেসে উঠে বলত 'গলা নামিয়ে কেত্তন? তুমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে সাইকেল চালাতে পারো?'

কিন্তু আজ কী হচ্ছে বংশীর?

কান জুড়োচ্ছে?

বংশী কাঁধের ঝোলাটায় একবার হাত দিল। তারপর হন হন করে এগিয়ে বেড়ার দরজাটা টেনে ঢুকে পড়ল।

ডেকে ঢোকার ভদ্রতার দরকারটা কী।

খুন করতে এসে কে কবে ভদ্রতা করে ডেকে ডুকে দরজা খোলায়?

শয়তান স্বপন দাস যদি তেড়ে আসে, বংশী আগে তার ওপরই ওই অস্তরটার ধার পরীক্ষা করবে।

বংশী উঠোনে কাউকে দেখতে পেল না, শুধু উঠোনটাই দেখতে পেল। তকতকে ন্যাপা পোঁছা, ধারে ধারে কেয়ারি করা ফুলের গাছের সারি। মাঝখানে একটা তুলসী মঞ্চ, তাতে সবুজ নধর ঝাঁকড়া একটা তুলসী গাছ। তুলসীর মুখোমুখি ছোট্ট একটি চালা ঘরের মধ্যে কাঠের চৌকীতে ফুলের মালা গলায় ঝোলানো বিগ্রহ মূর্তি।

বংশী কি চেঁচিয়ে ডাক দেবে 'খুব যে ঠাট বাট সাজিয়ে বসা হয়েছে, এবার আয়!'

কিন্তু বংশীর মুখ দিয়ে শব্দ বেরোলো না।

সারা পৃথিবী আচ্ছন্ন করে একটা মাত্রই শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে— অপরূপ এক আনন্দের ঝর্ণার কলকল শব্দ?

'নাচরে নাচ আমার সোনার যাদুমণি!
আরো নাচ দেবো তোরে ব্রজের নবনী!
আমি ব্রজের ননী এনে দেবো—
মা যশোদার ভাঁড়ার থেকে
ব্রজের ননী এনে দেবো।
আমি চুরি করে
এনে দেবো!
আমার ননীচোরারার জন্যে ননী
চুরি করে এনে দেবো—'

* * *

বংশী কি কোনো সাড়া শব্দ করেছিল?

কই না তো।

বংশী তো পাথরের প্রহরী মূর্ত্তির মতো অনড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবু হঠাৎ গানটা থেমে গেল।

হয়তো মানুষের উপস্থিতিরই একটা সাড়া আছে, যেটা অনুভূতিতে সাড়া এনে দেয়!

তা নইলে হঠাৎ থেমে গেল কেন?

আর তারপরই 'কে ?' বলে ঘরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল বোধকরি স্বপন দাসের বৌ সুধা।

সদ্যস্নানস্নিগ্ধ ভিজে এলো চুল, সারা শরীরে একটা অনির্বচনীয় মাধুরীর হিল্লোল কোলে বছর দেড়েকের একটা ফুটফুটে মোটাসোটা ছেলে।

এক মিনিট ? দু মিনিট ? তিন মিনিট ?

না এক যুগ, দু যুগ, তিন যুগ ?

না কি অনন্তকাল ?

সেই অনন্তকালের পর মেয়েটা কোলের ছেলেটাকে কোল থেকে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে দাওয়া থেকে নেমে উঠোনে চলে এল। আর তারপর বংশীর সামনে দাঁড়িয়ে তার চোখের দিকে সোজা পরিষ্কার চোখে তাকিয়ে যেন একটু হাসির মতো করে বলে উঠল, 'ছোরাটা এনেছো ?'

বংশী চমকে উঠল।

বংশী কেঁপে উঠল।

বংশী অজ্ঞাতসারে ঝোলাটা চেপে ধরে ধরা গলায় বলে উঠল 'কে বলল ?'

'আহা কেউ বলবে কেন ?'

স্বপন দাসের বৌ সুধা অনায়াস গলায় বলল, 'সেই রকমই তো কথা ছিল, ছোরাটা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।'

বংশী নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল।

বংশী যেন ভুলে গেল সে কোথায় আছে, কী দেখছে।

বংশী শুধু যেন একটা অপূর্ব পটভূমিকায় একখানা অপরূপ ছবি দেখছে।

পাশেই একটা গোড়া বাঁধানো চারা বকুল গাছ।

বংশী সেই বাঁধানো গোড়াটায় বসে পড়ল।

অথচ বংশী এই মুহূর্তেই তার সংকল্প সাধন করে চলে যেতে পারত।

কেউ টের পেত না।

দেড়বছরের ছেলেটা নিশ্চয় আদালতে সাক্ষী দিতে যেত না। বংশী এই সুবর্ণ সুযোগ হারাল।

বংশীর কপালে এই শরতের সকালেও ঘাম ফুটে উঠেছিল, বংশী শার্টের হাতায় ঘামটা মুছে ভাঙা ভাঙা বসা বসা গলায় বলল, 'এতদিন পরে এলাম আমি তোমায় খুন করতে ?'

আশ্চর্য্য! এই কথা বলল বংশী।

বংশীকে তো তা'হলে একটি পাকা অভিনেতা বলা যায়। অথবা পাকা মিথ্যেবাদী।

অথচ এতো বড়ো ডাহা মিথ্যে কথাটা বলেও বংশী লজ্জায় কেঁপে উঠল না। বংশী কেমন একটা শিথিল ভঙ্গীতে বসে রইল।

সুধা তাহলে সুধা নয়, কাজল!

কাজল তেমনি নির্নিমেষে তাকিয়ে বলল, 'তাই আসাই তো উচিত ছিল। তাছাড়া আসার আর কারণ কী হতে পারে ?'

বংশী শুকনো গলায় বলল, 'আর কোনো কারণ থাকতে পারে না ?'

'আমি তো ভেবে পাচ্ছি না কী কারণ থাকতে পারে।'

'এমনি দেখতে আসা যায় না ?'

কাজল হঠাৎ মুখটা ফেরালো।

তারপর হাতের উল্টো পিঠটা গালে ঘসে এদিক ফিরে বলল, 'মরে যাওয়া লোকের পরলোকের ঠিকানাটা দিল কে ?'

'দিয়েছে কেউ একজন,' বলল বংশী।

তারপর চারিদিকে তাকিয়ে বলল, 'সেই বাতিকটা আছে। কত গাছপালা লাগিয়েছ, কত ফুল ফুটিয়েছ।

যেন বন্ধু হৃদয়ের এই কোমল কথাগুলি বলবার জন্যেই এখানে এসেছে বংশী।

কাজল ফুলগুলোর দিকে তাকায়, প্রসন্নতার আলো মুখে মেখে বলে. 'কথাতেই তো আছে স্বভাব যায় না মলে।'

'মরার সংকল্প তো সত্যি ছিল না—' বংশী হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলে, 'তবে মেমারিতে ওকথা লিখে এসেছিলে কেন ?'

'মেমারিতে গিয়েছিলে তুমি ?'

কাজল একটু হেসে বলে, 'তা অবিশ্যি আসবেই জানতাম। টের পেয়েছিলাম লীলাদি খবর দেবার ষড়যন্ত্র করছে। তাই পালাতে হল। ভেবেছিলাম আবার তো সেই খোঁজাখুঁজি, সে পথ বন্ধ করে দিই। ভূত পেতনীকে তো আর কেউ খুঁজে বেড়ায় না? তবু দেখো—' আর একটু হাসল কাজল, 'শেষরক্ষা হল না।'

বংশী নির্নিমেষে কাজলের ফুটন্ত ফুলের মতো তাজা মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

এখন কাজল ভয় পেয়েছে, লজ্জাও পেয়েছে হয়তো, তবু শুকিয়ে যায়নি। হঠাৎ বংশীকে দেখে কি এত খুশী হয়ে উঠেছে কাজল যে ভয় লজ্জা সব ছাপিয়ে গেছে?

বংশীর চুপ করে তাকিয়ে থাকা মুখটার দিকে চেয়ে কাজল চোখ নামিয়ে নেয়, 'কী দেখছ?'

'দেখছি—ভালোবাসার মানুষ তাহলে পেয়েছ এতদিনে?'

কথাটার একটা ইতিহাস আছে। সর্বদা গুনগুন গান তো কাজলের মুখে লেগেই থাকত, এই গানটা খুব বেশী গাইত কাজল, 'আমার খুঁজতে খুঁজতে জীবন গেল, ভালবাসার মানুষ পেলাম না-রে—'

বংশী ঠাট্টা করে বলত, 'আহা সেই হতভাগা কোথায় কোন জঙ্গলে লুকিয়ে বসে আছে যে এত ডাক শুনতে পাচ্ছেনা?'

ঠাট্টাই করত, কারণ গানই ভাবত বংশী।

কাজল বংশীর কথায় চকিতে তাকাল, তারপর ঘাড় নীচু করে বলল, 'স্বপন আমার শিশুকালের খেলুড়ি। ওর সঙ্গেই একসঙ্গে ছড়া বাঁধতাম, তর্জা লড়া তর্জা লড়া খেলতাম, যাত্রার পালা অ্যাক্ট করতাম। আর পালা কেত্তনের দল খোলবার স্বপ্ন দেখতাম।'

'সে স্বপ্ন তাহলে এখন সফল হয়েছে?'

'যেমন পুঁজি যেমন সামর্থ—' কাজল মৃদু গলায় বলে, 'এখন ওর স্বপ্ন অনেক বড়ো দল করবার।'

'ও তাহলে এতদিন তোমার জন্যেই বসেছিল?'

কাজল মাথাটা আরো হেঁট করল, 'সে কথা কী করে বলি?

ও তো জানত না আমি চলে আসব। কোথা দিয়ে কী ঘটে গেল।'

ওদের কথার মাঝখানে, কাজলের অন্যমনস্কতার সুযোগে ছেলেটা যে কখন থপ্‌ থপ্‌ করে পা ফেলে দাওয়া থেকে নেমে এতোটা চলে এসে কাজলের শাড়ির একটু অংশ মুঠোয় বাগিয়ে ধরেছে ওরা খেয়াল করেনি, 'মা' বলে ডেকে উঠতেই চমকে ফিরে তাকাল কাজল, তারপর আস্তে কোলে তুলে নিল।

বংশী বললে, 'তর্কে তোমার জিৎই প্রমাণ হল।

ছেলেটার ওই 'মা' বলে ডেকে ওঠায় কাজল অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিল, এখন আরো হল।

কোল থেকে নামিয়ে বলল, 'খেলা করো বাবা, ফুল নাও।'

ফুল ছেঁড়াটা যে ছেলেটির বেশ প্রিয় খেলা তা' সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বংশী বলে, 'আমি যাই।'

কাজল যেন চমকে উঠলো। যেন থাকবার জন্য এসেছিল বংশী। কেমন ব্যগ্রভাবে কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'এসেছ তো রাতের গাড়িতে? কোথায় ছিলে রাতে?'

'হতভাগাদের যেখানে জায়গা। খোলা প্ল্যাটফর্মে।'

'কাল থেকে খাওয়া হয়নি?'

'হয়নি বটে।'

হঠাৎ বংশী বেশ জোর গলায় হেসে ওঠে, 'কেন, তুমি খাওয়াবে নাকি? স্বপনকুঞ্জের দাওয়ায় বসিয়ে এটা খাও ওটা খাও করে?'

কাজল আবার চোখ তুলে পষ্ট চোখে চেয়ে বলে, 'মেয়েমানুষে সব পারে। তাছাড়া আমার মতো দজ্জাল জাঁহাবাজ বেহায়া মেয়েমানুষ।'

'কাজল!'

কাজল তুলসীমঞ্চের একখানা তুলসী ছিঁড়ে নখে কাটতে কাটতে বলে, 'বলো!'

'সাত-আট বছরের চেনা জায়গাটা ছেড়ে চলে আসতে এতটুকু মন কেমন করল না?'

কাজল যেন নিজেকেই নিজে ব্যঙ্গ করে বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে, 'একেবারেই করল না, তা কী বলা যায়। সাত বছরের জেলখাটা আসামীরও জেলটা ছেড়ে চলে আসতে মন কেমন করে।'

'জেলখানা! তা বটে।'

থপথপিয়ে হেঁটে নীচু গাছের কেয়ারির ফুল ছিঁড়ে বেড়ানো ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বংশী বলে, 'কত বয়েস?'

কাজলের ঘাড়টা প্রায় বুকের ওপর ঝুলে পড়ে। কাজল অস্ফুটে বলে, 'দেড় বছর।'

'বাইরে থেকে মা যশোদার গান শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল—'

'সকালে গাই। গানের ভারী ভক্ত ও।'

বংশী চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

বলে, 'আমি যাচ্ছি কাজল।'

'তোমাকে এই রকম ধুলো পায়ে বিদেয় দিয়েছি, ঠাকুরের প্রসাদের বাতাসা একখানা দিয়েও এক গেলাশ জল দিইনি, এ আমার ঠাকুর সহ্য করবেন কী করে তাই ভাবছি।'

'তোমার ঠাকুর? ওঃ! সেই স্বপনদাস?'

ছি ছি ও কী কথা?'

কাজল ক্ষুব্ধ গলায় বলে, 'অবিশ্যি আমার মধ্যে ঠাকুর আছেন, আছেন আমার প্রাণের ঘরে, একথা আমার মতন পাপিষ্ঠার মুখে শোভা পায় না। তবু জানি তিনি আমায় ত্যাগ করেন নি। গান হয়ে ধরা দিয়েছেন, আনন্দ হয়ে আশ্রয় দিয়েছেন।'

বংশী হঠাৎ রুক্ষ গলায় বলে ওঠে, 'ঠাকুর-টকুর আমি মানিনা চিরকালই জানো।'

'তুমি মানোনা, আমি তো মানি।'

'তাতে আমার কী?' বংশী আরো রুক্ষ রুক্ষ গলায় বলে, 'স্বপনদাসের বাড়িতে আর তোমার হাতে জল গ্রহণ করব আমি এই আশা করছ?'

কাজল যেন দপ্ করে নিভে যায়।

যেন এতক্ষণে ওর খেয়াল হয়, ও কোন পরিস্থিতিতে কার সঙ্গে কথা বলছে।

আস্তে বলে, 'আমায় মাপ করো।'

চলে যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়ায় বংশী, হঠাৎ বলে ওঠে, 'আমি তোমায় মিছে কথা বলেছিলাম ধরতে পারলে না তো? আমি তোমায় আর তোমার ওই মনের মানুষকে খুন করতেই এসেছিলাম।'

'ধরতে পেরেছিলাম বৈ কি। এসেছিলে, কিন্তু পারলেনা।'

বংশী কাঁধের ঝোলাটা কাঁধে বাগিয়ে নিয়ে অন্য এক গলায় বলে, 'কিন্তু কেন পারলাম না বল দিকি?'

যেন সত্যিই বংশী নিজের অক্ষমতার রহস্য কাজলের কাছে জানতে চাইছে। বংশীর কণ্ঠস্বরে সেই অসহায়তা।

কাজল সহজভাবে বলে, 'ওর আর বলার কী আছে? খুনে নও বলেই পারলেনা। আর—আর ভালবাসা কখনো মরে যায় না বলে পারলে না।'

'তোমার ওপর আমার ভালবাসা ছিল একথায় তোমার বিশ্বাস আছে?'

'আমি তো পাথর নই। বিশ্বাস আছে, জিনিসটা শুধু 'ছিল' নয়, আজও আছে। আমিই ছোটলোক তাই—'

বংশী হঠাৎ পিছন ফেরে।

বেড়ার দরজার কাছে এগিয়ে যায়।

কিন্তু কাজলও যে পিছু পিছু এগিয়ে যায়, ব্যাকুলভাবে বলে, প্রাণ ঠাকুরপো কেমন আছে?'

'ভাল আছে। বিয়ে করেছে।'

'বিয়ে করেছে!'

'তা' অবাক হবার কী আছে? বিয়ে করে দোষ করেছে?'

'ছি ছি ওকথা বলছ কেন?'

'আমি অবিশ্যি তাই বলেছিলাম। বলেছিলাম বিয়ে করে পৃথিবীর সেরা মুখ্যু পুরুষ।'

কাজল একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'তোমার পক্ষে এটাই বলা স্বাভাবিক···বৌ কেমন হল?'

'ভাল।'

'রাঁধতে বাড়তে জানে ?'

'জানে।'

'দেখো আমি তো হাড় বেহায়া! তাই একটা কথা জিগ্যেস করছি—কেষ্টর বংশীদার খাওয়াটা কি কেষ্টর রান্নাঘরেই চলে ?'

বংশী চড়া গলায় বলে, বংশী সরকার অপারগ নয়। পিসি, কেষ্টর বৌ, কারুর ধার ধারেনা সে। স্বপাকে চালায়।'

'বুঝেছি, তাই এই হাল।'

'ওঃ! হালটাল চোখে পড়েছে ?' বংশী ব্যঙ্গের গলায় বলে, 'দেখে মন কেমন করছে না তো ?'

'যদি বলি করছে।'

'তাহলে বলব—মেয়েমানুষ যে কত নির্লজ্জ হতে পারে তার একটা জ্বলন্ত নমুনা দেখলাম।'

'শুধু এই তো ? তার বেশী নয়তো ?'

কাজল বংশীর বেড়ার দরজার ওপর রাখা হাতটার ওপর একটা হাত রেখে বলে, 'তাহলে—আরো একটু দেখতে হবে। ঠাকুরের. প্রসাদে সব অশুচি শুচি হয়ে যায়, আজ তোমায় আমি এভাবে তিন-বেলা উপোসী মুখ নিয়ে চলে যেতে দেব না। দেখি কেমন যাও।'

'কাজল. তুমি কি বলছ বুঝতে পারছ ?'

'পারছি বৈ কি! তবু জানই তো কাজল জন্ম বেহায়া নির্লজ্জের চূড়োমনি।'

দু'টো দিন কেষ্ট কম যন্ত্রণায় ভুগছে!

কেষ্ট খেতে পারছে না, শুতে পারছে না, কারখানায় যেতে পারছে না, ইন্দু কিছু বলতে এলে খেঁকিয়ে উঠছে।

নিজেকে খুনে ভাবছে প্রাণকেষ্ট. নিজেকে মহাপাপী। এক একবার ভাবছে কোথাও পালিয়ে যাই। কিন্তু ঘাড়ে ওই বোঝা!

ইন্দু!

ইন্দু না থাকলে নিশ্চয় পালাত কেষ্ট। অবিরত বিভীষিকা দেখছে প্রাণকেষ্ট। পুলিশ, হাতকড়া, আদালত, সাক্ষী, উকিল! দেখছে ফাঁসির দড়ি, বংশীর মুখ।

'আর পারা যাচ্ছেনা' বলে বিকেলে একসময় ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে কেষ্ট।

আর ঠিক সময় ইন্দু জানলার ধার থেকে ছুটে আসে, 'ওই তো বংশীদা আসছে।'

'বংশীদা। একলা?' লাফিয়ে ওঠে কেষ্ট।

'ওমা শোনো কথা! একলা নয়তো কি দোকলা আসবে?'

কেষ্ট ছুটে বেরিয়ে যায়। দরজাটা খোলাই রয়েছে।

টিউবওয়েলের ধারে হাত পা ধুচ্ছিল বংশী, প্রাণকেষ্ট দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কী ধুচ্ছো ওটা বংশীদা? রক্ত?

কোথা থেকে মেখে বয়ে এসেছে?

রাস্তায় কেউ দেখতে পায়নি? পুলিশে ধরেনি?

প্রাণকেষ্ট ভাঙা গলায় ডাকে, 'বংশীদা।'

বংশী চোখ তুলে তাকায়।

কোন কথা না বলে গামছা নিয়ে হাত পা মোছে ঘষে ঘষে; ধীরে সুস্থে গামছাটাকে তারে মেলে দেয়, তারপর ওর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, 'এই যে বিদ্যের সাগর! খুব ঠিকানা দিয়েছিলে বটে! মিথ্যে কী হয়রানি! আর তদুপরি অর্থ নষ্ট, দেহ কষ্ট!

মিথ্যে হয়রানি!

তার মানে খুঁজে বার করতে পারেনি বংশীদা!

ভগবান! তুমি তাহলে আছো! 'দয়াময় করুণাময়' এইসব ভাল ভাল নাম নিয়েই আছ!

প্রাণকেষ্টর চোখে জল আসে।

প্রাণকেষ্টর বুক থেকে পাহাড় নেমে যায়।

প্রাণকেষ্ট কষ্টে মুখ মলিন করে বলে, 'খুঁজে পেলে না?'

'কোথা থেকে পাব?' বংশী দরাজ গলায় বলে, 'তোর ওই ঠিকানার মাথামুণ্ডু থাকলে তো খোঁজ পাব?' দাওয়ায় উঠে এসে বলে, 'যাকেই বলি ঘোষচৌধুরীদের বাড়িটা কোনদিকে? সেই আকাশ থেকে পড়ে—'

'ঘোষচৌধুরী!'

প্রাণকেষ্ট অবাক হবে ? না আহ্লাদে দিশেহারা হবে ? না কি আরও একবার ভগবানকে ধন্যবাদ জানাবে ?

প্রাণকেষ্ট আস্তে বলে, 'ঘোষচৌধুরী তো নয়, রায়চৌধুরী !'

'রায়চৌধুরী ! বংশী উত্তেজিত গলায় বলে, 'রায়চৌধুরী ? রায়চৌধুরী বামুন হয় না ?'···বংশী পাকা অভিনেতার ভূমিকাই নেয়।

'কায়স্থও হতে পারে।'

'চমৎকার। তা সেটাই ভাল করে বলে দেওয়া হয়নি কেন ? আমি ভাবছি কায়েতের ব্যাটা ঘোষচৌধুরীই হবে।'

প্রাণকেষ্ট তবু ওই খুঁজে না পাওয়াটাই বজায় রেখে ভয়ে ভয়ে বলে, 'আমি বলি কি বংশীদা, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। খুঁজে যে পাওনি—'

'ওঃ ! ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে ?' বংশী ব্যঙ্গের গলায় বলে, 'এই যে আমি হতভাগা মিথ্যে হয়রানি হয়ে—সব মঙ্গলের জন্যে না ? ঠিক আছে। বলে দিচ্ছি 'বংশীদা খাও, বংশীদা খাও বলে কানের কাছে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করতে আসিসনি। হাওড়া হোটেল থেকে খেয়ে এসেছি আমি, ব্যাস !'

'সত্যি খেয়ে এসেছো ?'

'হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ। যা বাড়ি যা। আমি একটু ঘুমুবো।'

প্রাণকেষ্ট একটুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলে, 'তা' হলে আর যাচ্ছনা তো ?'

'কোথায় যাব ? তোর বাড়ি ?'

'না মানে ওই ক্যাওটা গোবিন্দপুরে ?'

হ্যাঁ, এছাড়া আর কী বলবে বংশী ?

বংশী কি প্রাণকেষ্টর কাছে বসে বসে গল্প করতে পারবে, 'কেষ্ট রে যার জন্যে ছোরা বাগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম তার হাতেই চব্য চোষ্য করে খেয়ে এলাম।···সে আমার সামনে বসে পাখার বাতাস দিয়েছে, 'আর একটু খেতেই হবে বলে জোর করেছে।'

বলতে পারবে 'কেষ্ট, ওর ঘর সংসার, ওর ছেলে, তার মাঝখানে ওকে এমন ছবির মতন মানানসই দেখতে লাগল যে মায়ায় মরে

গেলাম আমি। মনে হল এখানে ছাড়া আর কোথাও মানায় না ওকে। মনে হল এ ছবি যেন তোদের ভগবানের আঁকা। সেই আঁকার ওপর কি আমি কালি ঢেলে দেব?

আর সেই কথাটাই কি বলতে পারবে, 'কেষ্ট, শুনলে হেসে মরে যাসনে, সেই স্বপন দাস নামের লোকটা আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করেছে, আমায় দাদা আবার আসবেন' বলে নেমন্তন্ন করেছে।'

পাগল তো নয় বংশী যে এইসব কথা বলবে?

হলেই বা প্রাণকেষ্ট তার প্রাণের বন্ধু।

তাকে ওই 'ভুল ঠিকানা'র গল্প বলে ভোলানই ঠিক।

এক গেলাস ঠাণ্ডা জল ঢেলে দোর বন্ধ করে শুয়ে পড়ল বংশী।

আর তখন বংশী নিজেকে নিয়ে ভাবতে বসল।

কিন্তু আচ্ছা, বংশী নামের লোকটা কি সত্যি পাগল নয়?

পাগল নয় তো এসব কী করে এলো সে?

আর এত দিনের তুলে রাখা এতো সাধের আত্মরক্ষার অস্ত্রটাকে চুপি চুপি পুকুরের জলে জলাঞ্জলি দিয়ে এল কেন?

বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই 'কেন' টার উত্তর খুঁজতে থাকে বংশী।

কিন্তু চিন্তার খেই হারিয়ে যাচ্ছে। বারে বারে একটা উজ্জ্বল অথচ ছায়াচ্ছন্ন মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

'স্বপন পাগল, তাই তোমায় আবার আসতে বলেছে। আমি জানি তুমি আর আসবে না। খুন চেপেছিল তাই জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে এসেছিলে, সহজ মাথায় কি আর আসতে? কেউ আসে? তবু জানো, ভাবতে ভারী ইচ্ছে করছে, মাঝে মাঝে আসছ, তুমি অমন করে আমার ঠাকুরের প্রসাদ খাচ্ছ, আমার 'ননীচোরা'কে আশীর্বাদ করছ, আর আমায় 'কাজল' বলে—'

কথাটার শেষ খুঁজে পাচ্ছেনা বংশী।